মজুরের সন্ধান তাঁর লোকজনের মারফত তিনিই করিয়ে দেবেন। এ অঞ্চল তাঁর একরকম হাতের মুঠোয়। তাঁর লোকজনের হাত এড়িয়ে কারুর পালাবার ক্ষমতা নেই।

কথাটা যে কতখানি সত্য, একদিন পার না হতেই বুঝতে পারলাম। পরের দিন সকালেই মিঃ নিশিমারা তাঁর গবেষণাগার আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন। সাধারণ কীটতত্ত্বের গবেষণা তিনি যে করেন না, তাঁর ল্যাবরেটরীর নানা বিভাগ দেখেই তা অবশ্য বোঝা যায়। শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, কীটপতঙ্গ লালন-পালন ও পরিবর্ধন করবার জন্য রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক নানা যন্ত্রপাতি ও উপাদান-উপকরণ তাঁর বিরাট ল্যাবরেটরিতে আছে।

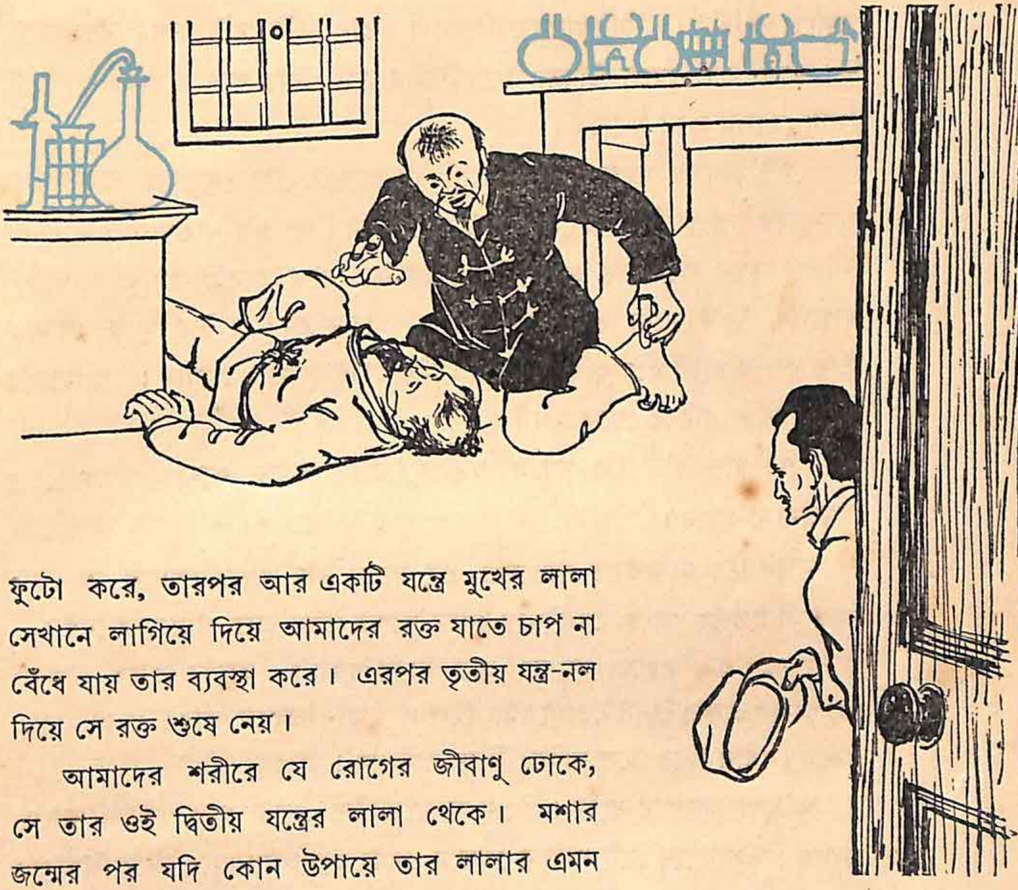
মিঃ মার্টিন এক সময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পোকা-মাকড়ের ভেতর মশা-ই দেখছি আপনার গবেষণার প্রধান বিষয়।'

মিঃ নিশিমারা একটু হেসে বললেন, 'তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে? মানুষের সভ্যতার মশাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু। এই সাখালীন দ্বীপ থেকে শুরু করে সমস্ত পৃথিবীতে শুধু ম্যালেরিয়ার বাহন হিসাবে মশা কি পরিমাণ ক্ষতি প্রতিনিয়ত করছে, ডাক্তার হিসেবে আপনার নিশ্চয় অজানা নয়।'

মিঃ মার্টিন বললেন—'কিন্তু আপনার গবেষণাগারে ত দেখছি মশার লালন-পালনই হ'ল আসল কাজ। এর দ্বারা ম্যালেরিয়ার কি প্রতিকার হবে বুঝতে পারছি না।'

নিশিমারা আবার হেসে বললেন, 'না বোঝবারই কথা। শুধু মশা মেরে নয়, মশা যাতে আর ম্যালেরিয়ার বাহন না হতে পারে, সেই চেষ্টা করে আমি ম্যালেরিয়া সমস্যার নতুন ভাবে সমাধান করতে চাই।'

আমাদের একটু অবাক্ হতে দেখে তিনি বললেন,—'মশা কি করে রোগের বীজাণু ছড়ায় আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে। তার মুখ একটা ডাক্তারী যন্ত্রের বাক্স বললেই হয়। গায়ের ওপর বসে প্রথম একটি যন্ত্রে সে চামড়া



ফুটো করে, তারপর আর একটি যন্ত্রে মুখের লালা সেখানে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের রক্ত যাতে চাপ না বেঁধে যায় তার ব্যবস্থা করে। এরপর তৃতীয় যন্ত্র-নল দিয়ে সে রক্ত শুষে নেয়।

আমাদের শরীরে যে রোগের জীবাণু ঢোকে, সে তার ওই দ্বিতীয় যন্ত্রের লালা থেকে। মশার জন্মের পর যদি কোন উপায়ে তার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন করে দেওয়া যায় যে, বিষাক্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু তার ভেতর বাঁচতেই পারবে না, তাহলে মশা হাজার কামড়ালেও আর আমাদের ভয় নেই। আমার গবেষণাগারে মশার লালা-পরিবর্তনের সেই চেষ্টাই আমি করছি।'

বিশ্বাস করি না করি, নিশিমারার কথায় প্রতিবাদ কিছু করিনি। সমস্ত গবেষণাগারটা আমাদের কাছে তখনই কেমন রহস্যময় মনে হয়েছে। আগের রাত্রের সেই অমানুষিক চীৎকারের শব্দের কথা তখনও

ঘনাদার গল্প

ঘনাদার গল্প

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ, ৩৩০০ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৬৫

প্রথম সংস্করণ
৭ই আশ্বিন, ১৩৬৩

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ও
চিত্রাঙ্কন :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬



উৎসর্গ

ছোটদের জন্যে লেখার প্রথম উৎসাহ
বিশেষ ভাবে যাঁর কাছে পেয়েছি
সেই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন
শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকারকে



মশা

গল্পটাই আগে বলব, না, গল্প যাঁর মুখে শোনা, সেই ঘনশ্যাম-দার বর্ণনা দেব, বুঝে উঠতে পারছি না।

গল্পটা কিন্তু ঘনশ্যাম-দা, সংক্ষেপে ঘনাদার সঙ্গে এমন ভাবে জড়ান, যে তাঁর পরিচয় না দিলে গল্পের অর্ধেক রসই যাবে শুকিয়ে। সুতরাং ঘনাদার কথা দিয়েই শুরু করা বোধ হয় উচিত।

ঘনাদার রোগা লম্বা শুকনো হাড়-বার-করা এমন একরকম চেহারা, যা দেখে বয়স আন্দাজ করা একেবারে অসম্ভব। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন যে কোন বয়সই তাঁর হতে পারে। ঘনাদাকে জিজ্ঞেস করলে অবশ্য একটু হাসেন, বলেন, "তুনিয়াময় টহলদারী করে বেড়াতে বেড়াতে বয়সের হিসেব রাখবার কি আর সময় পেয়েছি! তবে—" বলে ঘনাদা যে গল্পটা শুরু করেন, সেটা কখনো সিপাই মিউটিনির, কখনো বা রুশ-জাপানের প্রথম যুদ্ধের সময়কার। সুতরাং ঘনাদার বয়স আন্দাজ করা আমরা ছেড়ে

দিয়েছি। শুধু এইটুকুই মেনে নিয়েছি যে গত দু'শ বছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যান নি, হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই।

কয়েক বছর হ'ল কেন যে কৃপা করে তিনি আমাদের এই গলিটির ছোট্ট মেসে এসে উঠেছেন তা ঠিক বলতে পারি না। আমাদের ছুটিছাটার আড্ডায় তিনি যে নিয়মিতভাবে এসে বসেন, এও তাঁর অসীম করুণা বলতে হবে। প্রায়ই অবশ্য তিনি ভয় দেখান যে পাততাড়ি গুটিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, কিন্তু সাধারণতঃ সেটা মাসের শেষে, মেসের খরচের তাগাদা পড়বার সময়। বুঝে শুনে কিম্বা হতাশ হয়েই তাঁর কাছে তাগাদা করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। ঘনাদা আমাদের আড্ডায় এসে নিয়মিত-ভাবে সবচেয়ে ভালো আরাম-কেদারাটায় বসেন, যার ভাগ্য যেদিন ভাল থাকে, তার কাছে সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরান, তারপর চোখ বুজে প্রায় ধ্যানস্থ হ'য়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হয়তো আমাদের কোন একটা কথায় বেশ একটু উচ্চৈঃস্বরেই হেসে ওঠেন।

অপ্রস্তুত হয়ে আমরা তখন তাঁর দিকে তাকাই। ঘনাদা একটু নড়ে চড়ে উঠে বসে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলেন, "কি কথা হচ্ছিল—বন্যার ?"

আমরা লজ্জিত ভাবে স্বীকার করি যে সামান্য দামোদরের বানের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম।

ঘনাদা আমাদের দিকে এমন করুণা-মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে তাকান মনে হয় দামোদরের বানে আমাদের নিজেদের ভেসে যাওয়াই ভালো ছিল। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, "টাইড্যাল ওয়েভ কাকে বলে জান? দেখেছ কখনো সেই প্রলয়ের ঢেউ—যাকে বলে সমুদ্র-জলোচ্ছ্বাস!"

সঙ্কুচিতভাবে স্বীকার করি যে নামটা জানলেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিজেদের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

ঘনাদা হেসে বললেন,—"কেমন করে আর থাকবে! তাহলে শোন। তখন মুক্তোর ব্যবসা করব বলে তাহিতি দ্বীপে গিয়ে উঠেছি···"

ঘনাদার সেই সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক গল্প থেকে জানা যায় যে কি করে এই রকম এক টাইড্যাল ওয়েভের মাথায় এক বেলায় তাহিতি থেকে একেবারে ফিজি দ্বীপে গিয়ে তিনি উঠেছিলেন।

এ গল্প শোনার পর আমাদের অবস্থা কি হয়, তা বলাই বাহুল্য। দিন দুপুরে সূর্যের সামনে মিটমিটে লণ্ঠনের মত আর কি!

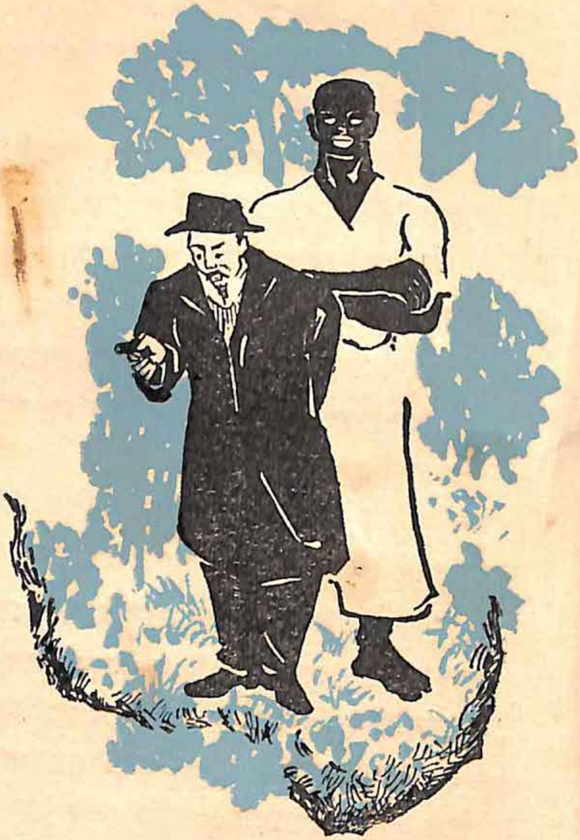
ঘনাদার ভয়ে আমাদের অত্যন্ত সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয়; কিন্তু আঁটঘাট বেঁধে যতই কিছু বলি না কেন, ঘনাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। দেখা যায়, ঠিক তিনি টেক্কা দিয়ে বসে আছেন!

হয়তো কথায় কথায় কে বলেছে যে, আজকাল অনেকেরই চোখে চশমা —চোখের জোর আর বড় বেশী নেই। ঘনাদা তাঁর মার্কা-মারা হাসিটি হেসে অমনি গিয়ে উঠলেন একেবারে অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের চূড়োয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখী 'কণ্ডর' শকুনের বাসার খোঁজে।

'হ্যাঁ, চোখের জোর দেখেছি বটে সেবার! অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের ওপর পথ হারিয়ে ফেলেছি, শীতে প্রায় জমে যাবার যোগাড়, সঙ্গে একজন আর্জেনটাইন শিকারী আর 'বোরোরো' জাতের এক সাড়ে ছ-ফুট লম্বা রেড্ ইণ্ডিয়ান গাইড্। সন্ধ্যা হয় হয়, আর খানিকক্ষণের মধ্যে পথ না খুঁজে পেলে এই পাহাড়ের ওপরই বরফ চাপা পড়ে মরতে হবে। এমন সময় আমাদের চূড়ার নিচেকার খানিকটা মেঘ একটু ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু বারো হাজার ফুট ওপর থেকে সেই ফাঁক দিয়ে কি আর দেখা যাবে। কিন্তু তখনো 'বোরোরো' জাতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা তো জানি না। হাত দুটো দূরবীণের মত করে সে একবার চোখের সামনে ধরলে, তারপর বললে, 'ব্যস্ আর ভয় নেই!'

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভয় ত নেই, কিন্তু কি দেখতে পেলে তুমি?'

সে হেসে বললে, 'কেন, ওইত নিচে শিকারীদের তাঁবু ফেলা রয়েছে, বড় একটা কুকুর নিয়ে লাল কোট-পরা এক শিকারী এইমাত্র তাঁবুতে ঢুকল'—শুনে আমি ত অবাক্।



ঘনাদার কথা শুনে আমরা ততোধিক অবাক্ হয়ে বললাম,—"বারো হাজার ফুট ওপর থেকে লাল রঙের কোট পর্যন্ত দেখতে পেলে!"

"তা না হলে আর চোখের জোর কিসের! শকুনের চোখ কি রকম জানো? দু মাইল ওপর থেকে ভাগাড়ের গরুর লাশ ওরা দেখতে পায়। এই বোরোরো শিকারীদের চোখ তেমনি।"

এরপর আমরা যে নির্বাক হয়ে গেলাম তা বলা বাহুল্য।

প্রায় নির্বাক হয়েই আজকাল থাকি। এর ভেতর সেদিন কি থেকে বুঝি মশার প্রসঙ্গ উঠে পড়েছিল। ঘনাদা তখনও এসে পৌঁছান নি। তাই বোধ হয় আমাদের অতটা সাহস। তাছাড়া ভেবেছিলাম যে সামান্য মশা মারবার ব্যাপারে ঘনাদা তাঁর কামান দাগা প্রয়োজন বোধ করবেন না।

কিন্তু ভুল ভাঙতে আমাদের দেরী হোল না। বিপিন সবে তাদের

গাঁয়ে কি ভাবে মশা মারবার ব্যবস্থা হচ্ছে সেই কথা তুলেছে, হঠাৎ দরজায় ঘনাদার আবির্ভাব।

"কি কথা হচ্ছিল হে?"

আমরা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বলি,—"নাঃ, এমন কিছু নয়, এই মশা মারবার কথা বলছিলাম।"

বিপিন তাড়াতাড়ি আরাম-কেদারাটা ছেড়ে সসম্মানে ঘনাদার জন্যে জায়গা করে দেয়।

ঘনাদা তাতে সমাসীন হয়ে শিশিরের কাছে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরিয়ে বললেন, "ওঃ, মশা!"

আমরা কতকটা আশ্বস্ত হই। যাক ঘনাদার দৃষ্টি তাহলে মশা পর্যন্ত পৌঁছবে না! কিন্তু পরমুহূর্তেই বোমা ফাটল—যে সে বোমা নয়, একেবারে 'অ্যাটমিক'!

"হ্যাঁ মেরেছিলাম একবার একটা মশা।"

আমরা স্তম্ভিত! ঘনাদা মশার প্রসঙ্গও বাদ দিতে চান না দেখে নয়, স্তম্ভিত, তাঁর এই অবিশ্বাস্য বিনয়ে। মশাই যদি মারতে হয়, তাহলে ঘনাদা মাত্র একটি মশা মারবেন, এ যে কল্পনাও করা যায় না!

শিশির সাহস করে বলেই ফেলল—"একটি মশা মেরেছিলেন!"

"হ্যাঁ একটিমাত্র মশাই জীবনে মেরেছি।" আমাদের হতবুদ্ধি করেই ঘনাদা বলে চললেন—"মেরেছি ১৯৩৯ সালের ৫ই আগষ্ট, সাখালীন দ্বীপে!"

আমরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "সাখালীন দ্বীপের নাম শুনেছ, কিন্তু কিছুই জানো না—কেমন? দ্বীপটা জাপানের উত্তরে সরু একটা করাতের মত উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ দিক্‌টা ছিল জাপানীদের, আর উত্তরটা রাশিয়ার। সেই দ্বীপের পুব-দিকের সমুদ্রকূলে তখন অ্যাম্বার সংগ্রহ করবার একটি কোম্পানীর হয়ে কাজ করছি। এমন অখাদ্য পাণ্ডববর্জিত

জায়গা দুনিয়ায় আর আছে কি না সন্দেহ। বছরের অর্ধেক সেখানে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে, আর বাকি অর্ধেক বরফে সব জমে যায়। তার ওপর আছে ভীষণ তুষার-ঝড় আর গাঢ় জমাট কুয়াসা। কোন রকমে দামী কিছু অ্যাম্বার সংগ্রহ করেই সেমুখো আর হব না এই ছিল মতলব, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। আমাদের কোম্পানীর তান্‌লিন নামে এক চীনা মজুর একদিন সকালে হঠাৎ নিরুদ্দেশ; তার সঙ্গে এ পর্যন্ত যা অ্যাম্বার যোগাড় হয়েছিল, সেই মহামূল্য থলিটাও।

সাখালীন দ্বীপটি ত নেহাত ছোটখাট নয়, তার বেশীর ভাগ আবার জঙ্গল আর পাহাড়। সে সব পাহাড়-জঙ্গলের অনেক জায়গায় মানুষের পায়ের চিহ্নই পড়েনি। সুতরাং এই দ্বীপে কাউকে খুঁজে বার করা সোজা নয়। তবে একটা আশার কথা ছিল এই যে, অ্যাম্বারের মত দামী রত্ন চুরি করে সাখালীন দ্বীপে লুকিয়ে থেকে কারুর লাভ নেই। সে চোরাই মাল বেচতে তাকে কোন বড় সভ্য দেশে যেতেই হবে। আর সাখালীন দ্বীপ ছেড়ে এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে কাউকে যেতে হলে প্রধান শহর অ্যালেক্‌জ্যান্‌ড্রোভস্‌ক্‌ থেকে ব্লাডিভস্টকের স্টীমার না ধরে উপায় নেই। অক্টোবরের পরে অবশ্য সমুদ্র জমে বরফ হয়ে যায়। তখন লুকিয়ে কুকুর-টানা শ্লেজে করে পালান সম্ভব। কিন্তু প্রধান স্টীমার-ঘাটায় কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করলে তার আগে চোর কিছুতেই সাখালীন থেকে বেরুতে পারতে পারবে না। অক্টোবর পর্যন্ত তাকে খুঁজে বার করবার সময় অন্ততঃ আমরা পাব।

বেতারে অ্যালেক্‌জ্যান্‌ড্রোভস্‌ক্‌-এর পুলিসের কাছে সমস্ত খবর পাঠিয়ে আমি ও আমাদের ক্যাম্পের ডাক্তার মিঃ মার্টিন দুজন কুলি নিয়ে তানলিনের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কয়েকদিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যখন প্রায় হতাশ হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটা হদিস পেয়ে গেলাম।

টিয়ারা পাহাড়ের কাছে সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁবু ফেলেছি। ওখানকার



আদিম গিলিয়াক জাতির এক শিকারীর কাছে সকাল বেলায় একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, এই দিক্ দিয়ে একজন চীনাকে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে খবরে বিশ্বাস করবার মত কোন প্রমাণ পাই নি।

রাত্রে তাঁবুর মধ্যে ঘুমোন একরকম অসম্ভব। সাখালীন দ্বীপে বড় হিংস্র জানোয়ার বলতে শুধু ভালুক ছাড়া আর কিছু নেই। সাধারণতঃ তারা

মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দিনে মাছি ও রাত্রে মশা যা আছে, তা হিংস্র জানোয়ারকে হার মানায়। আমি আর মিঃ মার্টিন তাই কোন রকমে ঘুমোতে না পেরে তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গল্প করছি। হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, 'দেখেছেন মিঃ মার্টিন!'

মিঃ মার্টিনের দৃষ্টিও সেদিকে তখন গেছে। অবাক্ হয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! বেশ জোরালো আলো বলে মনে হচ্ছে। এই জনমানবহীন জায়গায় ওরকম আলো আসছে কোথা থেকে? ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি?'

খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে বললাম, 'না, ভূতুড়ে নয়, বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার। দূরের ওই পাহাড়ে ঢিবিটার পেছনে নিশ্চয় কোন একটা বাড়ি আছে—এ আলো সেখান থেকেই আসছে।'

মিঃ মার্টিন অবাক্ হয়ে বললেন, "কিন্তু এখানে শখ করে অমন বাড়ি করবে কে? গিলিয়াক, ওরোক বা টুঙ্গুস জাতের অসভ্য শিকারী ছাড়া এ অঞ্চলে ত কেউ আসে না। এদিকে কোন খনি ইদানীং হয়েছে বলেও জানি না।'

ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহল যত বেশীই হোক, সন্ধান নেবার জন্যে সকাল পর্যন্ত আমরা নিশ্চয় অপেক্ষা করতাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে রাত্রির স্তব্ধতা হঠাৎ এক অমানুষিক চীৎকারে যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

একবার আমি ও মিঃ মার্টিন দুজনে দুজনের মুখের দিকে চাইলাম, তারপর ভেতর থেকে টর্চটা বের করে এনে কোন কথা না বলেই বেরিয়ে পড়লাম। একেবারে নিরস্ত্র যে আমরা ছিলাম না তা বোধ হয় বলবার দরকার নেই। দুজনের কোমর-বন্ধেই পিস্তল আঁটা ছিল।

যে পাথুরে ঢিবিটার পেছন থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল, সেটা খুব বেশী দূর নয়, প্রায় শ তিনেক গজ হবে। ঢিবিটার পাশ দিয়ে ঘুরে যাবার পরই দেখা গেল আমাদের অনুমান ভুল হয় নি। একটা মাঝারি গোছের বাড়ির একটা জানালা থেকে উজ্জ্বল আলোটা দেখা যাচ্ছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অমানুষিক যে চীৎকার আমরা শুনেছিলাম,

তা একবার উঠেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। চারিধার এমন শান্ত যে দুজনে এক সঙ্গে সে শব্দ না শুনলে মনের ভুল বলেই সেটা গণ্য করতাম।

বাড়িটার কাছে এসে তখন আমরা বেশ একটু ফাঁপরে পড়েছি। এখন করা যায় কি! অজানা জায়গায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাড়িতে হঠাৎ মাঝ-রাতে এসে ডাকাডাকি করাটা যে মোটেই সুবিধের হবে না, তা বুঝতে পারছিলাম; কিন্তু ফিরে যাওয়া ত তখন আর যায় না।

যে জানালাটা দিয়ে আলো আসছিল সেখানে গিয়ে সাবধানে একবার উঁকি দিলাম। মস্তবড় একটা ঘর, মিউজিয়াম যেমন থাকে অনেকটা সেইরকম। প্রকাণ্ড একটা কাঁচে ঘেরা টেবিল ঘরটার মাঝখানে বসান। সে কাঁচের ভিতর কি আছে দেখতে পেলাম না। লোকজনও কেউ সেখানে নেই। এত রাত্রে থাকবার কথাও নয়।

সেখান থেকে সরে এসে দরজায় ধাক্কা দেব কি না ভাবছি, এমন সময় পেছন থেকে সরু অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ইংরাজীতে এক আদেশ শুনলাম, 'প্রাণে বাঁচতে চাও ত হাত তোল—'

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি, বেঁটে গোছের জোয়ান একটি লোক আমাদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তার পেছনে লম্বা-চওড়া যমদূতের মত চেহারার এক প্রহরী; তারও হাতে পিস্তল।

ব্যাপারটা বেশ নাটুকে হয়ে জমে উঠেছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরস্পরের পরিচয় পাওয়ার পর সব আবার থিতিয়ে সহজ হয়ে গেল।

পিস্তল হাতে যিনি আমাদের হাত তুলতে বলেছিলেন, জানতে পারলাম, তিনি মিঃ নিশিমারা নামে একজন জাপানী কীটতত্ত্ববিদ্। সাখালীনের কীটপতঙ্গ নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে এই ঘাঁটিটি বসিয়েছেন। আমরা কি উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম শোনবার পর লজ্জিত হয়ে তিনি আমাদের কয়েকদিন তাঁর ওখানে থেকে তাঁর কাজকর্ম দেখে যেতে অনুরোধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ আশ্বাসও দিলেন যে পলাতক চীনা

ভুলতে পারিনি। নিশিমারাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেটা কোন বন্য জন্তুর আওয়াজ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মনে হয়েছে কিছু যেন তিনি গোপন করে যাচ্ছেন।

সেই গোপন রহস্য যে কি, সেইদিন রাত্রেই টের পেলাম। নিশিমারা আমাদের যত্ন-আতিথ্যের কোন ত্রুটি করেন নি। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা তখন আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিতে শুতে এসেছি, হঠাৎ মিঃ মার্টিন বললেন, 'এরি মধ্যে শুয়ে কি হবে? আসুন একটু বাইরে ঘুরে আসি।' তাঁর কথায় রাজী হয়ে বাইরে বেরুতে গিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম। আমাদের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ!

'এর মানে?' মিঃ মার্টিন অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

মানে ঠিক না বুঝতে পারলেও এই দরজা বন্ধ করার পেছনে যে কোন শয়তানী মতলব আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ তখন আর আমাদের নেই।

কিন্তু এত সহজে আমরা হার মানব কেন? ছাদের কাছে হাওয়া-চলাচলের একটা ছোট ভেন্টিলেটর ছিল। কোন রকমে তারই পাল্লা ভেঙে দুজনে সেখান দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে নামলাম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। শুধু ল্যাবরেটরীর একটা ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। সন্তর্পণে সেই ঘরটার পেছনে একটা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই সেই কালকের রাতের মত রক্ত জল-করা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সে আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জানালা বেয়ে ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়েছি। কিন্তু একি ব্যাপার! যার খোঁজে আমরা বেরিয়েছি, সেই তান্‌লিনই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে অসীম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার একপাশে কাল রাতে যাকে দেখেছিলাম সেই যমদূতের মত কাফ্রী প্রহরী দাঁড়িয়ে, অন্য পাশে ফাপা একটা কাঁচের মোটা নলের জিনিস হাতে করে মিঃ নিশিমারা।

'ব্যাপার কি মিঃ নিশিমারা ?' বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম। মিঃ নিশিমারা আমাদের দেখে রাগে বিস্ময়ে খানিক কথাই বলতে পারলেন না। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললেন, 'আমার আতিথেয়তার ওপর একটু বেশী অত্যাচার করছেন না কি আপনারা ? এ ঘরে আসতে কে আপনাদের অনুমতি দিয়েছে ?'

"কেউ দেয় নি, এখন বলুন এখানে হচ্ছে কি ?"

মিঃ নিশিমারা অদ্ভুত ভাবে হেসে বললেন, 'যা হচ্ছে তা'ত দেখতেই পাচ্ছেন। এ লোকটাকে সাপে কামড়েছে, তারই চিকিৎসা করছিলাম।'

মিঃ মার্টিন তখন মেঝেয় বসে পড়ে তান্‌লিনকেই পরীক্ষা করছিলেন। তিনি মুখ তুলে কঠিন স্বরে বল্লেন, 'এ'ত মারা গেছে। আর সাপেও একে কামড়ায় নি। বলুন, কি করেছেন একে ?'

"কি করেছি জানতে চান ?" নিশিমারা কখন এরি মধ্যে কোথা থেকে একটা পিস্তল হাতে নিয়েছেন লক্ষ্যই করিনি। সেইটে আমাদের দিকে উঁচিয়ে ধরে তিনি বল্লেন,—"বেশ, সেই কথাই বলব তাহলে, শুনুন। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শুনে মরার সৌভাগ্য আপনাদেরই হোক।" আপনাদের তান্‌লিন সাপের কামড়ে মারা যায় নি—মারা গেছে মশার কামড়ে —সামান্য একটা মশার কামড়ে !"

নিশিমারা তীক্ষ্ণ উচ্চ অট্টহাস্যে আমাদের স্তম্ভিত করে আবার বলতে লাগলেন—'বিশ্বাস করতে পারছেন না ব্যাপারটা, কেমন ? কোন ভাবনা নেই, এক্ষুণি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাদের দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বলে যাই, শুনুন। মশার লালার রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা যা বলেছিলাম মনে আছে ত। সে পরিবর্তন আমি সত্যিই করেছি। ডিম থেকে শুরু করে মশা যখন সামান্য জলের পোকা হয়ে থাকে, তখন পর্যন্ত তার ওপর নানা প্রক্রিয়া চালিয়ে মশার লালার এমন রাসায়নিক পরিবর্তন আমি ঘটিয়েছি যে, সাপের বিষের চেয়েও সে লালা মারাত্মক

হয়ে উঠেছে। কাল রাত্রে যে চাৎকার শুনেছিলেন, সে এমনি একজনের ওপর মশার কামড়ের পরীক্ষার ফল। তান্‌লিনের অবস্থা ত সামনেই দেখতে পাচ্ছেন—এইবার আপনাদের পালা।'

নিশিমারার ইঙ্গিতে সেই যমদূত তখন মিঃ মার্টিনকে অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছে। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিশিমারা বললেন, 'এই কাঁচের নল দেখছেন, এর ভেতর একটি মাত্র বিষাক্ত মশা ভরা আছে। এই একটি মশা কিন্তু এখনো আপনার মত জন-বিশেক জোয়ানকে অনায়াসে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে। আপনি বিজ্ঞানের পীঠস্থান, সভ্য মার্কিন মুলুকের লোক। তাই আপনাদের তুই বন্ধুর



মধ্যে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রাণ দেওয়ার গৌরব আমি আপনাকেই দিতে চাই। বেশী কিছু আপনাকে করতে হবে না। এই নলটি এমন কায়দায় তৈরী যে গায়ে চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঢাকনাটা ভেতর দিকে খুলে যায়,—হিংস্র মশাটাও উড়ে এসে কামড়ে দিতে দেরী করে না……'

সমস্ত মাথার ভেতর কেমন ঝিমঝিম করছিল! মনে হচ্ছিল আর যেন দাঁড়াতে পারব না! কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ মরিয়া হয়ে সজোরে একটা

ঘুসি ছুঁড়লাম। নিশিমারা আচমকা ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে কাঁচের নলটা মেঝেয় আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

তারপর যে ব্যাপার ঘটল তা বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা কর যে, ভাঙা নল থেকে বেরিয়ে সেই সাক্ষাৎ শমন ঘরের ভেতর উড়ে বেড়াচ্ছে আর তিনটে মানুষ উন্মাদ হয়ে তাকে এড়িয়ে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করছে—ঘরের মাঝখানে আবার তান্‌লিনের মৃতদেহ।

কোনরকমে দরজার কাছে পৌঁছে খিলটা খুলে বেরুতে যাব এমন সময় সেই বিশাল কাফ্রী বাঘের মত আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

আর বুঝি আশা নেই! মশাটা ঠিক আমার নাকের কাছে একবার ঘুরে গেল। তার পরেই সেই কাফ্রী এক সঙ্গে পাঁচটা রেলের ইঞ্জিনের মত চীৎকার করে আমার ঘাড়ের ওপর নেতিয়ে পড়ে গেল। বুঝলাম, মশার দংশন-জ্বালার সঙ্গে সব জ্বালা তার জুড়িয়েছে।

কিছু ভাববার আর সময় নেই। উঠে পড়ে আবার পালাতে যাচ্ছি এমন সময়ে দেখি মিঃ নিশিমারা যুযুৎসুর প্যাঁচে মিঃ মার্টিনকে চিত করে ফেলে দিয়েছেন আর মশাটা ঠিক তার মাথার কাছে উড়ছে। ছুটে গিয়ে হেঁচকা টান দিয়ে মিঃ মার্টিনকে খানিকটা সরিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিশিমারার আর্তনাদ শোনা গেল! মশাটা ঠিক তাঁর গালের ওপর গিয়ে বসেছে।

এবার আর একমুহূর্ত দেরি হোল না। আমার প্রচণ্ড এক চাপড় গিয়ে পড়ল নিশিমারার গালে। মশা আর নিশিমারার ভবলীলা এক সঙ্গেই সাঙ্গ হয়ে গেল!

মশা মারবার পরিশ্রমেই যেন হাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘনাদা বললেন,—"জীবনে তারপর মশা মারতে আর প্রবৃত্তি হয় নি।"

পোকা



ঘনাদা সেদিন প্রায় জব্দ হয়ে গিয়েছিলেন

প্রায় জব্দ বলছি এই জন্যে যে সত্যিকারের জব্দ হবার পাত্র ঘনাদা নন। যত বেকায়দায় পড়ুন না কেন, নিজেকে সামলে নেবার অসামান্য প্রতিভা ঘনাদার আছে। তেলা-মাছের মত যে-কোন বেয়াড়া অবস্থা থেকে তিনি পিছলে বেরিয়ে যেতে পারেন।

সেদিন কিন্তু অবস্থাটা তাঁর বড় বেশী কাহিল হয়ে উঠেছিল। মেসের সকলের হাসি-ঠাট্টার চোটে তাঁর এতদিনের খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রায় ভেসে যায় আর কি!

মেসের তেতলার একটি ছোট চোর-কুঠরি গোছের ঘরে ঘনাদা একা থাকেন। এ ব্যবস্থাটা শুধু তাঁর নিজেরই মনঃপুত নয়, আমাদের অনুমোদিত। ঘনাদার মত অসামান্য পুরুষের সংস্পর্শে দিনরাত থাকা একটু বিপজ্জনক বলেই আমাদের ধারণা।

ঘনাদার তেতলার সেই ঘরে সেদিন রাত বারোটা নাগাদ হঠাৎ একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধেছে বলে আমাদের মনে হ'ল। শনিবারের রাত। পরের দিন ছুটি, সুতরাং ভোরে উঠবার তাড়া নেই বলে আমরা সবাই যে যার দলে একটু বেশীক্ষণ পর্যন্ত তাস পাশা খেলে সবেমাত্র শুতে গেছি, এমন সময়

টেবিল-চেয়ার ওল্টানোর সঙ্গে ওপরকার ঘরে ঘনাদার অমানুষিক চীৎকারে বিছানা থেকে উঠে বসলাম!

ব্যাপার কি!

তাস পাশা ইত্যাদি খেলা ঘনাদার দুচক্ষের বিষ। শনিবার রাত্রে তাই তিনি আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে অন্যদিনের চেয়ে একটু সকাল সকালই শুতে চলে যান। তারপর ওপরের ঘরে আলবোলায় তাঁর আরাম করে তামাক খাওয়ার শব্দ কখন করাতে কাঠ-চেরার মত মধুর নাক-ডাকার আওয়াজে মিশে যায়, সমস্তই আমরা নিচে থেকে টের পাই।

আজ হঠাৎ সেই সুখনিদ্রায় কি এমন আকস্মিক ব্যাঘাত ঘটল। ঘনাদার চীৎকার শুনলে ত' মনে হয়, ব্যাঘাতটা হিংস্র কোন সাতদিনের উপোসী বাঘ বা পাগলা গারদ ভেঙে বেরিয়ে আসা ছুরি হাতে খুনে গুণ্ডা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু ঘনাদার মত ত্রিভুবনজয়ী বীরের কাছে এসব ত' তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার বস্তু! তাহলে ব্যাপারটা কি হতে পারে?

এই রহস্যময় ব্যাপারের নায়ক ঘনাদাই পর-মুহূর্তে হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি, ঘনাদা!"

আমরা সবাই এখনো জেগে আছি ঘনাদা বোধ হয় ভাবেন নি। আমাদের সকলের উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের সামনে প্রথমটা এক মুহূর্তের জন্যে তিনি কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন! কিন্তু সে বোধ হয় আমাদের মনের ভুল। পরের মুহূর্তেই আমাদের সকলকে একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়ে তিনি চাপা গলায় বললেন, "ব্যাপার? ব্যাপার যা ভেবেছিলাম তাই!"

কথাগুলো যেমন দুর্বোধ, ঘনাদার গলার স্বর তার চেয়ে বেশী রহস্যময়। সে স্বরে এমন একটা বিভীষিকার আভাস যে মনে হ'ল শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে হিম একটা জলের ধারা যেন হঠাৎ বয়ে গেল!

শিবু-ই প্রথম এ ধাক্কা কতকটা সামলে উঠে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "ভূত-টুত নাকি ঘনাদা ?"

"ভূত !" ঘনাদার বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ স্বরে বোঝা গেল, সামান্য ভূত-টুতের কথা তুলে শিবু তাঁকে কতখানি অপমান করেছে।

"সবাই মিলে একবার দেখে আসব !" প্রস্তাব করলে গৌর।



ঘনাদার তাতে কিন্তু ঘোর আপত্তি দেখা গেল। তাঁর কথায় মনে মনে হ'ল, আমাদের অতখানি বিপদের মুখে পাঠাতে তিনি রাজী নন। তিনি বরং রাতটা আমাদের কারুর ঘরে শুয়ে কাটিয়ে দিয়ে সকালে যা করবার করবেন।

কিন্তু আমরা অত সহজে নিরস্ত হ'তে পারলাম না। ঘনাদার মত লোককে যার জন্যে মাঝরাত্রে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়, সে ব্যাপার যে কি, সন্ধান করবার চেষ্টা না করে আমরা থাকি কি করে !

সবাই মিলে সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে ঘনাদার ঘরে গিয়ে উঠলাম। ঘনাদা তাড়াতাড়িতে আলোটাও জ্বালতে পারেন নি। ঘর একেবারে অন্ধকার। আলো জ্বাললে কি দেখতে হবে কে জানে ভেবে সুইচটা টিপতেও যেন ভয় করছিল! শিশিরই প্রথম সুইচটা টিপে দিলে সাহস করে।

কিন্তু কোথায় কি !

ওল্টানো চেয়ার টেবিল ছাড়া ঘরে ত কোন কিছু দেখবার মত নেই !

যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আটকাতে না পেরে ঘনাদা আমাদের পেছন

পেছনই ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। আমরা অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই পরম গম্ভীর মুখে তিনি বল্লেন, "কি বলেছিলাম!" তাঁর ভাবখানা এই যে ঘরে কিছু না থাকাই যেন একটা ভয়ঙ্কর রহস্য।

আমরা কিছু বলবার আগেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত শব্দ শব্দ শোনা গেল। গোঁ করে একটা শব্দ মেঝে থেকে ওপরে উঠে ঠক করে একটা আওয়াজে শেষ হ'ল। আচমকা এই শব্দে আঁতকে উঠে প্রথমটা প্রায় নিজেদের অজান্তে হুড়মুড় করে সিঁড়ির দিকে হটে গিয়েছিলাম, কিন্তু পর মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়।

গৌরই ছিল সবার সামনে। গোড়ায় পিছু লাফ দিয়ে হটে এলেও সে তখন মেঝে থেকে সেই ভয়ঙ্কর রহস্যের মূলাধার বস্তুটিকে তুলে ধরেছে।

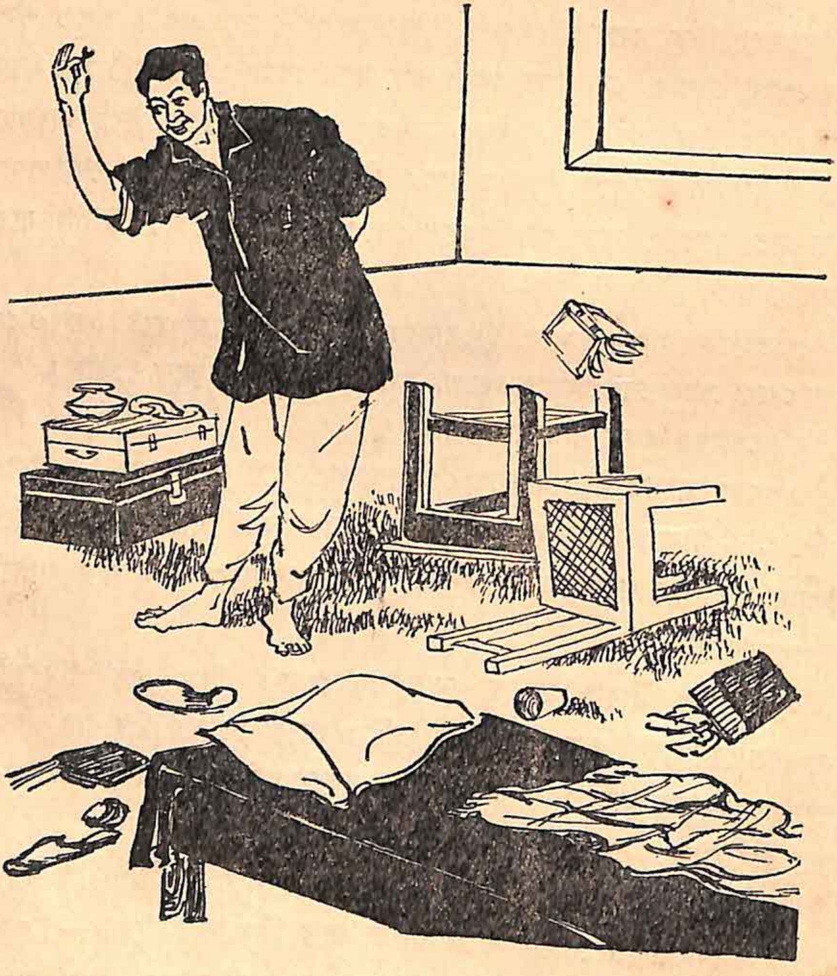
বড় গোছের একটা নারকুলো পোকা!

একবার ঘনাদার আর একবার সেই পোকার দিকে চেয়ে মেসের সকলের হাসি আর থামতে চায় না। শিশির অনেক কষ্টে তারি মাঝে দম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "শেষকালে এই একটা পোকা আপনাকে এমন ভয় পাইয়ে দিলে ঘনাদা!"

সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসির ধুম পড়ে গেল। কিন্তু এত হাসি-ঠাট্টা ঘনাদাকে যেন স্পর্শই করল না। অবিচলিত ভাবে নিজের বিছানার ওপর এসে বসে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তিনি আমাদের সকলের দিকে একবার তাকালেন, তারপর গম্ভীরমুখে বললেন, "একটা পোকা দেখে ভয় পেয়েছি, না?"

পা ছুটো গুটিয়ে আর একটু আরাম করে বসে তিনি হঠাৎ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"একটা পোকার পেছনে আট হাজার মাইল কখনো ছুটে বেড়িয়েছ? তিন হাজার টন মরা পোকা নিয়ে কি করবে কখনো ভাবতে হয়েছে? পকেটে একটা কাঁচের বন্ধ শিশি আর হাতে একটা কাগজ সম্বল করে

আফ্রিকার গহনতম বনে-জঙ্গলে-জলায় কখনো একটা পোকার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে ?"



আমাদের হাসি তখন প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। তবু একবার জিজ্ঞাসা করলাম, "কি সে পোকা ঘনাদা ! এই নারকুলো পোকা ?"

"না, তার নাম—সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া !"

"থাক থাক ঘনাদা ! পোকা হলেও কৃষ্ণের জীব ত' বটে। অমন যা-তা গালাগালি দেওয়াটা কি উচিত ?"

শিবুর বলার ধরণে হাসিটা আর একবার উথলে উঠতেই এক ধমকে সেটা থামিয়ে দিয়ে ঘনাদা বললেন,—"গালাগাল নয়, ওই হল তার বৈজ্ঞানিক নাম।"

আমরা সিঁড়িটার দিকে পা বাড়াবার আগেই ঘনাদা শুরু করে দিলেন,—

"১৯৩১ সালের ২২শে ডিসেম্বর। ল্যাটভিয়ার রিগা শহরের সমস্ত পথঘাট বরফে ঢেকে গেছে। আগের রাত্রে এমন প্রচণ্ড তুষার-ঝটিকা শহরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে যে, মিউনিসিপ্যালিটির লোকজন এসে বরফ কেটে পরিষ্কার না করে দেওয়া পর্যন্ত অনেকে বাড়ির দরজাই খুলতে পারে নি। আমি যথারীতি প্রাতঃভ্রমণ সেরে আমার হোটেলে ফিরছি, এমন সময় খটাখট্ শব্দে এক ঘোড়ায় টানা 'ড্রোস্‌কি' আমার কাছেই এসে থামল। মোটা আস্ত্রাকান গায়ে মাথায় রুশ টুপি-পরা মিলিটারি চেহারার একটি লোক তা থেকে নেমে আমায় ভালো করে লক্ষ্য ক'রে হাতে একটি চিঠি দিলে।

সে চিঠি পড়ে সত্যিই অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জেনারেল ভরনফ্ এখানে আছেন তা ত জানতাম না !'

লোকটি সবিনয়ে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি আজ তিন বছর এখানেই আছেন। আপনার সঙ্গে এখুনি একবার দেখা করতে চান।'

'তা ত চিঠি পড়েই বুঝলাম, কিন্তু তিনি যার সঙ্গে দেখা করতে চান আমি আমি যে সেই লোক, আপনি বুঝলেন কি করে ?"

আস্ত্রাকান কোটটার গলাটা একটু তুলে দিয়ে লোকটি বললে,—"তা কি আর বুঝতে দেরি হয় ! জেনারেল আপনার অনেক গল্পই আমার কাছে করেছেন, তাছাড়া রিগা শহরের এই রক্ত-জমান শীতে শুধু একটা

সোয়েটার চাপিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরুতে আর কেউ যে পারে না তা আমি ঠিক জানি।”

শিবুর একটু বুঝি কাশি শোনা গেল। সেইসঙ্গে আমাদেরও। ঘনাদা গ্রাহ্য না করে বলে চললেন,—

“গেলাম তারপর জেনারেল ভরনফের বাড়ি। রিগা উপসাগরের দক্ষিণ পাড়ে নোংরা পুরোনো শহরের এক ঘিঞ্জি পাড়ায় ভরনফের ভাঙা দু-কামরা আস্তানা দেখে যত অবাক্ হলাম, তার চেয়ে বেশী হলাম স্বয়ং তাঁকে দেখে।

জেনারেল ভরনফের সঙ্গে আফ্রিকায় শিকারের সূত্রে আমার পরিচয়। একসঙ্গে নাইপার নদীতে আমরা ডিঙি বেয়ে দু-শ পাঁচ-শ মাইল ঘুরে বেড়িয়েছি, কঙ্গোর গভীরতম জঙ্গলে গরিলার খোঁজে ফিরেছি প্রাণ হাতে নিয়ে, মাসাইদের সঙ্গে শুধু তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করেছি। খাঁটি প্রাশিয়ান বলতে যা বোঝায়, চেহারায় চরিত্রে তিনি ঠিক তাই ছিলেন। শরীর ও মন দুই-ই একেবারে শক্ত ইস্পাতের তৈরী। শারীরিক কষ্ট কাকে বলে জানেন না, মানসিক দুর্বলতা কাকে বলে বুঝতে দেন না কখনো। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মাণ সেনাপতি হিসাবে তিনি যথেষ্ট নাম করেছিলেন, রাজকীয় সম্মানও পেয়েছিলেন প্রচুর। সেই লোকের এই দুরবস্থা কি করে সম্ভব? আর্থিক অবস্থা তাঁর যত খারাপ হয়েছে, শরীর ভেঙে পড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। এ যেন আগের ভরনফের ছায়ামাত্র!

ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হ'লেও কি করে এ দুর্দশা তাঁর হল না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে ভরনফ্ বললেন, ‘এ শহরে আপনি এসেছেন জেনে সে কথা বলতেই ডেকে পাঠিয়েছি। পৃথিবীর আর কেউ যে কথা জানে না তাই আজ আপনাকে বলব। আসুন।’

আমায় ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে ভরনফ্ একটা দেরাজ খুলে একটা ফটো বার করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ ফটো কার জানেন?’

ফটোটা দেখেই চিনেছিলাম। অবাক্ হয়ে বল্লাম, ‘এ ফটো ত



ডাঃ রথষ্টাইনের। পোনরো বছর আগে সি-সি মাছি সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে আফ্রিকায় মারা পড়েন।'

ভরনফ্ ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, মারা সে পড়েনি, আজও বেঁচে আছে। নিজের মৃত্যু সে বিশেষ কোন কারণে ওইভাবে রটিয়েছিল।'

'কিন্তু আপনি সে কথা জানলেন কি করে ?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভরনফ্ প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন,—'সে আমার ভাই।'

'আপনার ভাই! ডাঃ রথষ্টাইন হলেন ইহুদি, আর আপনি খাস জার্মাণ। কি রকম ভাই ?'

'সহোদর ভাই। এক বাপ-মায়েরই আমরা সন্তান!' বলে ভরনফ্ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে যখন আমার আলাপ তখন আফ্রিকায় শিকারের ছুতোয় এই ভাইকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।'

একটু চিন্তিতভাবে ভরনফের দিকে তাকালাম। দুঃখে অভাবে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি ? ভরনফ্ আমার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝে ম্লান হেসে বললেন, "আপনি মনে করেছেন, আমার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছে! রথষ্টাইন ইহুদি হয়ে কি করে আমার সহোদর ভাই হ'তে পারে আপনি ভেবে পাচ্ছেন না, নয় ? গত মহাযুদ্ধে বীরত্বের জন্যে জার্মাণীর শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েও লাটভিয়ার এই শহরে একটা নোংরা পল্লীতে এই দারিদ্র্যের মধ্যে চোরের মত কেন দিন কাটাচ্ছি ভাবলেই বুঝতে পারবেন।"

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে ভরনফ্ আবার বললেন, 'আমায় সবাই খাস জার্মাণ হিসেবে প্রাশিয়ানদের চেয়েও কড়া দাম্ভিক বলে জানত, এখনও অনেকে জানে; কিন্তু আসলে আমিও ইহুদি। তবে আমার ভাই ইহুদি জাতের গৌরব ছিল একদিন, আর আমি ছিলাম কুলাঙ্গার। জার্মাণীতে—আর শুধু জার্মাণীতে কেন—সমস্ত ইউরোপে ইহুদি-বিদ্বেষ কি রকম প্রবল, তা নিশ্চয় জানেন। গত দু হাজার বছর ধরে আমাদের ওপর যে অত্যাচার এরা করেছে, তার তুলনা হয় না। মাঝে মাঝে এ বিদ্বেষ কিছুদিনের জন্যে একটু চাপা থেকেছে মাত্র, তারপর আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আমাদের ধনে-প্রাণে ধ্বংস করেছে। ছেলেবেলা থেকেই এই ইহুদি-বিদ্বেষ আমাদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছে—কিন্তু আমাদের দু-ভাইকে দু-ভাবে।

আমার ভাই জ্যাকব, রথষ্টাইন আমাদের পদবী—চেষ্টা করেছে বৈজ্ঞানিক হিসেবে ইহুদি জাতের মুখোজ্জ্বল করতে, আর আমি পিতৃ-পরিচয় ভাঁড়িয়ে জার্মাণীদের সঙ্গেই মিশে যেতে চেয়েছি ইহুদি-বিদ্বেষ এড়াবার জন্যে। বিদ্যাবুদ্ধিতে জ্যাকবের চেয়ে আমি অনেক খাটো। বাপ-মা দুই-ই মারা যাবার পর বিশ বছর বয়সে আমি তাই একটা খনির চাকরি নিয়ে ব্রেজিলের জঙ্গলে চলে যাই। সেখান থেকে বছর পাঁচেক বাদে যখন জার্মাণীতে ফিরে এলাম তখন আমি একেবারে খাঁটি প্রাশিয়ান, চেহারায় চলনে বলনে আমায় অন্য কিছু বলে চেনে কার সাধ্য।

ঘটনাচক্রেই প্রাশিয়ান সাজবার এ সুযোগ আমার মিলে গেছল। বিশুদ্ধ প্রাশিয়ান বংশের একটি ছেলে আবিষ্কার-পর্যটনের নেশায় ব্রেজিলের জঙ্গলে এসে আমাদেরই খনির আস্তানায় মারা পড়ে। তার সঙ্গে আমার চেহারার মিলের কথা অনেকেই সে সময় বলেছিল। তারি সুযোগ আমি নিলাম। মরবার সময়—তার সেবা করার দরুন সে কয়েকটি কাগজপত্র ও জিনিস আমার হাতেই দেয় জার্মাণীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। সেই কাগজ-পত্রের জোরে আমি অনেকটা নির্ভয়ে ভরনফ্ সেজে বসলাম। সামরিক বিভাগে ঢুকে উন্নতিও করলাম যথেষ্ট! কেউ কোনদিন একটু সন্দেহও করতে পারল না।

এতদিনে ইচ্ছে করেই জ্যাকবের সঙ্গে আমি দেখা করিনি যদিও তার সব খবরই রাখতাম। একদিন হঠাৎ বার্লিন থেকে মিউনিক যাবার পথে ট্রেনের একটি কামরায় তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি তখন বড় মিলিটারি অফিসার; মিউনিক যাচ্ছি একটা জরুরী তদন্তে, আর জ্যাকব সেখানে যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকদের কি একটা সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে।

আমি তাকে গোড়াতেই চিনলেও আমার মিলিটারি জাঁদরেল পোশাকে ও চালচলনে সে প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। সন্দিগ্ধভাবে দু-একবার তাকিয়েছিল মাত্র। পরিচয় দেবার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু দিতে হ'ল

ঘটনাচক্রে। মাঝখানের একটা স্টেশনে গাড়ী থামতে আমার একজন তাঁবেদার কর্মচারী আমায় সেলাম দিতে এল আমার কামরায়। জ্যাকবকে দেখলেই ইহুদি বলে চেনা যায়। চেহারায় পোশাকে নিজের জাত লুকোবার কিছুমাত্র চেষ্টা তার নেই। আমার তাঁবেদার অফিসারটি যেমন গোঁড়া তেমনি অভদ্র। সে জ্যাকবের মুখের সামনেই আমায় বললে, 'এই ইহুদি জানোয়ারটা আপনার সঙ্গে একগাড়িতে যাচ্ছে! দেব এ কামরা থেকে ঘাড় ধরে বার করে' ?

মরমে মরে গিয়েও বাইরে দাম্ভিকতার ভান করে বললাম,—'থাক আর দরকার নেই, রাস্তায় কত বেড়াল-কুকুরও থাকে !'

একজন ইহুদিকে একটু জব্দ করবার সুবিধে না পেয়ে একটু অপ্রসন্ন হয়েই অফিসারটি শেষ পর্যন্ত কামরা থেকে নেমে গেল। গাড়িও দিল ছেড়ে। জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ ফিরে দেখি, জ্যাকব একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিলাম, কিন্তু খানিক বাদেই তার দিকে না চেয়ে পারলাম না।

এখনও সে আমার দিকে চেয়ে আছে কিন্তু তার মুখে একটু অনুকম্পার হাসি। কামরায় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই—এই ভাগ্যি, নইলে একটা ইহুদির সামনে কড়া প্রাশিয়ান অফিসারের এরকম অস্বস্তি দেখে তারা সন্দিগ্ধই হয়ে উঠত।

হঠাৎ জ্যাকব বললে, 'ওইটুকুর জন্যেই ধরা পড়ে গেলে আইজ্যাক।'

যতদূর সম্ভব মিলিটারি মেজাজের ভান করে বললাম, 'কি বলছ কি তুমি ! কার সঙ্গে কথা কইছ জান ?'

'আর আস্ফালন করে লাভ কি আইজ্যাক ? আমি তোমায় চিনতে পেরেছি। সত্যিকারের প্রাশিয়ান অফিসার একটা ইহুদিকে কামরা থেকে নামিয়ে দেবার এ সুযোগ কক্ষনো ছাড়ত না !'

সজল চোখে খানিক তার দিকে তাকিয়ে থেকে তার হাত দুটো

ব্যাকুলভাবে ধরে ফেলে এবার বললাম, 'আমায় ক্ষমা কর জ্যাকব! কি দুঃখে এ ছদ্মরূপ নিয়েছি তা জান?'

'তা জানি; কিন্তু ইহুদি-বিদ্বেষের প্রতিশোধ কি এইভাবে নেওয়া যায়? ওই পোশাক তোমার চামড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে না!'—



জ্যাকবের চেহারা একমুহূর্তে এমন বদলে গেল যে, সত্যি ভয় পেয়ে গেলাম! তার চোখ দিয়ে যে আগুন ঠিকরে বেরুল, বুকের ভেতরকার কত বড় আগ্নেয়গিরি থেকে তা উঠে আসছে বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

একটু শান্ত হয়ে জ্যাকব বল্লে, 'যেমন করে পার লুকিয়ে চুরিয়ে মিউনিকে আমায় সঙ্গে দেখা কোরো। ইহুদি-বিদ্বেষের কি প্রতিশোধের আয়োজন হচ্ছে, তোমায় বুঝিয়ে দেব।'

মিউনিকে সত্যিই তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং যা শুনেছিলাম ও দেখেছিলাম তাতে বুঝেছিলাম, অতবড় বৈজ্ঞানিক হয়েও ইহুদি-বিদ্বেষের দরূন পদে পদে প্রত্যেক জায়গায় অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে জ্যাকব একেবারে

উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু উন্মাদ হয়ে সে যে প্রতিশোধের পরিকল্পনা করছে, তার বৈজ্ঞানিক কূট কৌশল শুধু শয়তানের মাথাতেই জন্মান সম্ভব। তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে বুঝলাম, ইহুদি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়বার একই প্রেরণা আমাদের দুজনের মধ্যে কি বিভিন্নভাবে কাজ করেছে! জাতের কুলাঙ্গার হয়েও আমি ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে জয় করে মানুষকে ভালবাসতে শিখেছি, আর জাতির অপমানের শোধ নিতে গিয়ে জ্যাকব মানুষের শত্রুই হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার পরিকল্পনায় সমস্ত মানবজাতির কতখানি ক্ষতি হবে বুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তীব্র বিদ্রূপের হাসি হেসে সে বলেছিল, 'নকল প্রাশিয়ান সাজতে সাজতে তুমি খানিকটা তাই হয়ে গেছ। আমার কথা তুমি বুঝবে না।'

এর কিছুদিন পরে সে 'সি-সি' মাছি সম্বন্ধে গবেষণা করবার নামে আফ্রিকায় চলে যায়; কিন্তু আমি জানতাম ওটা তার একটা ছুতোমাত্র।'

ভরনফের কথা শেষ হ'লে আমি একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্যাকব রথষ্টাইন যে সত্যি মারা যান নি, আপনি জানলেন কি করে?'

'জানলাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে।' একটা কাগজের ফাইল দেরাজ থেকে বার করে ভরনফ্ বল্লেন, 'খবরের কাগজের এই কাটিংগুলো পড়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, গত দশ বছরে এসিয়া-ইউরোপের নানা জায়গায় কি রকম অদ্ভুতভাবে ছোটখাট দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দেশভরা সোনার শস্য চক্ষের নিমেষে কি ভাবে ছারখার হয়ে গেছে! এখনও পর্যন্ত জর্জিয়া, রুমানিয়া, মোরাভিয়া প্রভৃতি ছোটখাট রাজ্যের ওপর দিয়েই এ বিপদ গেছে। বড় বড় দেশ এখনো রেহাই পেয়ে আছে। কিন্তু বেশীদিন আর নয়। তার আয়োজন সম্পূর্ণ হলেই সমস্ত ইউরোপ সে বিপদ ঠেকাতে পারবে কিনা সন্দেহ!'

বললাম, 'কিন্তু এই ব্যাপারে আমাকে কেন ডেকেছেন বুঝতে পারছি না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি, শুনুন। আমি নিজে বৃদ্ধ অথর্ব হয়ে পড়েছি।



জার্মাণীর জঙ্গীমহলে এতদিন পরে কেমন করে জানি না আমার সত্যকার জাত সম্বন্ধে একটা সন্দেহের হাওয়া ওঠায় আমায় এখানে এসে প্রায় অজ্ঞাত-বাস করতে হচ্ছে। যা আর পারি না, তাই আপনাকে করতে হবে। জ্যাকবকে খুঁজে বার করতে হবে। আমি জানি যদি কেউ পারে ত আপনিই পারবেন।'

অবাক্ হয়ে বললাম, 'বলেন কি! পোনরো বছর যে লোকের কোন পাত্তা নেই, তাকে আমি কোথায় খুঁজে বার করব? করবই বা কি করে?'

একটা ছোট কাঁচের কৌটা খুলে ধরে ভরনফ্ বললেন, 'খুঁজে বার করবেন এর সাহায্যে। এই আপনার নিদর্শন!'

'একি'। সত্যিই বিমূঢ় হয়ে বললাম, 'এ'ত একটা মরা পোকা দেখছি!'

'হ্যাঁ, এই মরা পোকাই আপনাকে তার সন্ধান বলে দেবে। এ পোকা আফ্রিকার কোথায় যে জন্মায়, কোন বৈজ্ঞানিক তা আজো জানে না। এ পোকা যেখানে পাবেন, জানবেন জ্যাকব সেখানেই তার চরম শয়তানী ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছে।'

'কিন্তু জ্যাকবের সন্ধান পেলেই বা করব কি?'

আমার হাতে ছোট একটা বন্ধ কাঁচের শিশি আর একটা কাগজ দিয়ে ভরনফ্ বললেন, 'কি করবেন, এই কাগজে লেখা আছে। আজ দশ বছর পরে জ্যাকবের পৈশাচিক চক্রান্ত ব্যর্থ করবার এই অস্ত্র আমি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করেছি।'

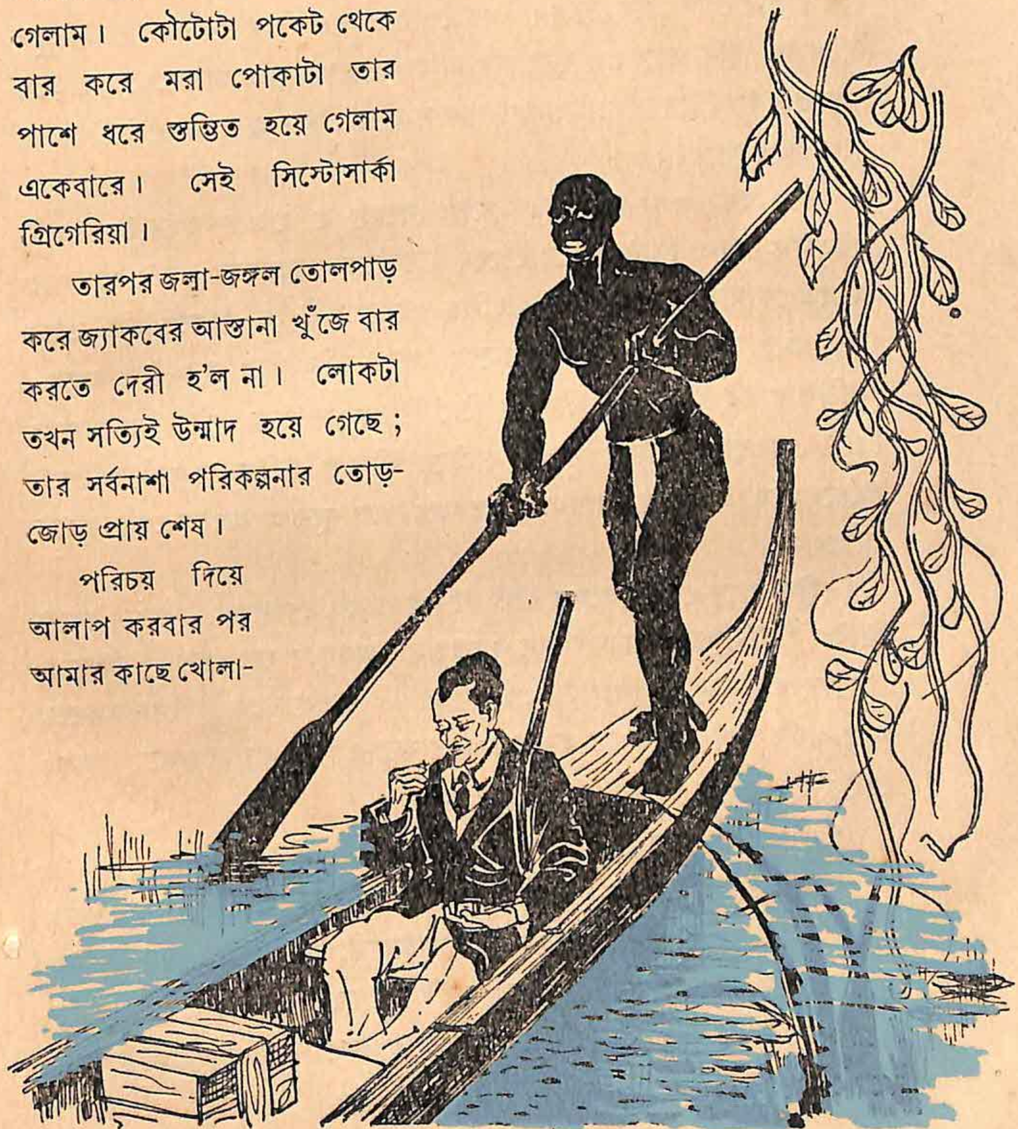
ঘনাদা চুপ করলেন। গৌর জিজ্ঞাসা করলে, "তারপর! জ্যাকবের খোঁজ আর পেলেন না বুঝি?"

"না, পেলাম বৈকি! না পেলে কার্সিকাতে তিন হাজার টন মরা পোকা জমল কি করে?"

শিবু অধৈর্যের সঙ্গে বললে, "আহা, খুলেই বলুন না একটু!"

ঘনাদা একটু বিজয়-গর্বের হাসি হেসে বললেন, "সমস্ত আফ্রিকা ঘুরে বার-এল-আরব নদীর ধারে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ ডিঙ্কাদের দেশে তখন এসেছি। পকেটে সেই পোকার কৌটো তখনও আছে, কিন্তু মনে কোনো আশা নেই জ্যাকবকে খুঁজে পাবার। সাতফুট লম্বা আমার ডিঙ্কা-মাঝির সঙ্গে তার সালতির চেয়ে সরু লম্বা ডিঙিতে সেদিন জলার মধ্যে

কুমীর শিকারে গেছি। হঠাৎ তীরের ঝোপ থেকে একটা পোকা ঠিক আমার কোলের ওপর এসে পড়ল। ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়ে হঠাৎ চমকে গেলাম। কৌটোটা পকেট থেকে বার করে মরা পোকাটা তার পাশে ধরে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম একেবারে। সেই সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া।



তারপর জল্লা-জঙ্গল তোলপাড় করে জ্যাকবের আস্তানা খুঁজে বার করতে দেরী হ'ল না। লোকটা তখন সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেছে; তার সর্বনাশা পরিকল্পনার তোড়-জোড় প্রায় শেষ।

পরিচয় দিয়ে আলাপ করবার পর আমার কাছে খোলা-

খুলি ভাবেই তিনি তখন সব কথা বললেন! ছুদিন পরে ইয়োরোপের আকাশ কি ক'রে অন্ধকার হয়ে যাবে সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়ার ঝাঁকে বলতে বলতে তাঁর চোখ জ্বলে উঠল। গত পোনরো বছরের সাধনায় এমন অদ্ভুত পরিবর্তন তিনি তাদের জীবনধারায় নাকি করেছেন যে, কোথা থেকে ছাড়লে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে তারা মাঠ-ঘাট শ্মশান করে দেবার জন্যে নামবে, তিনি তা বলে দিতে পারেন।

তাঁর প্রথম লক্ষ্য ইটালি। ছুদিন পরেই ছ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী এক ঝাঁক পোকা তিনি উড়িয়ে দেবেন ইটালিতে। তারপর একটা শ্যাওলার ছোপও কোথাও থাকবে না। ইটালির পর জার্মাণী ও ইংলণ্ডে কি ভাবে তিনি তাঁর অজেয় বাহিনী পাঠাবেন, সব নাকি তাঁর ছক-বাঁধা আছে। আফ্রিকার এই অঞ্চলে সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়ার জন্মস্থান খুঁজে বার করে তিনি এমনভাবে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে নিজের পরিকল্পনা-মাফিক তৈরী করেছেন যে, ইউরোপ দশ বছর সমস্ত অস্ত্র দিয়ে যুঝেও তাদের শেষ করতে পারবে না।

ছুদিন বাদে সেই পতঙ্গের ঝাঁক সত্যিই উড়তে দেখলাম। সুডান থেকে লিবিয়া টিউনিসিয়ার আকাশ যেন রাতের মত অন্ধকার হয়ে গেল! কিন্তু এ পতঙ্গের ঝাঁক তবু ইটালি পর্যন্ত পৌঁছল না। অর্ধেক মরল লিবিয়ার মরুতে, আর বাকী অর্ধেক কর্সিকার সমুদ্রের ওপর ঝরা-পাতার মত মরে ঝরে পড়ল। সেই মরা পোকার ওজনই তিন হাজার টন।"

"কিন্তু তারা মরল কেন?" জিজ্ঞাসা করলে শিশির।

"মরল ভরনফ্ যে বন্ধ শিশিটি দিয়েছিলেন তার দরুন। তার ভেতর এমন একটি রোগের বীজাণু ছিল, যা সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়ার যম। ছুদিন আগে একটি পতঙ্গের মধ্যে সেই বিষ আমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম একটা ছুঁচ দিয়ে। সেই রোগ তারপর সংক্রামক হয়ে সমস্ত পতঙ্গ-বাহিনীকেই ধ্বংস করে দেয়!"

"ওঃ সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া তাহলে পঙ্গপাল !" বললে শিবু। "কিন্তু সে পঙ্গপাল ত শেষ হয়ে গেছে, তা হলে আজ আপনার একটা পোকায় অত ভয় কিসের ?"

অবজ্ঞার হাসি হেসে ঘনাদা বললেন, "সিস্টোসার্কা গ্রিগেরিয়া শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু জ্যাকব রথষ্টাইন ত হয়নি। পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে বসে সে আবার কোন্ শয়তানী ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে কে জানে ? হয়ত ওই পোকাটাই তার অগ্রদূত !"



নুড়ি

ঘনাদা হাই তুললেন।

ঘনাদার হাই তোলা একটা অনুষ্ঠান বিশেষ। গরাদের ফাঁক থেকে পুঁচকে ছ'পেয়ে জানোয়ারগুলোর বেয়াদবী দেখে দেখে সিংহ মশাইএর যখন দিক্ ধরে যায়, তখন তার আলস্য-ভাঙা দেখবার সৌভাগ্য যদি কারুর হয়ে থাকে তাহলে সে ঘনাদার হাইতোলার কিঞ্চিৎ মর্ম বুঝতে পারবে।—তেমনি বিরাট মুখব্যাদান, তেমনি দন্তরুচিকৌমুদির শোভা ও তেমনি তিন বৎসর তৈলবিহীন গরুর গাড়ির চাকার আওয়াজের মত সুদীর্ঘ একটানা একটি সুর-লহরী। সিংহ মশাই তবু ঘনাদার মত তুড়ি দিতে পারে না।

ঘনাদার হাইতোলা দেখে আমরা সত্যি তাজ্জব হয়ে গেলাম। তাজ্জব হলাম তাঁর হাই তোলার দৃশ্যে নয়, তিনি যে হাই তুললেন কি করে শুধু এই কথা ভেবে।

রাম, শিবু ও আমি পরস্পরে হতাশ ভাবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। হায়, হায়!—সন্ধ্যার সমস্ত আয়োজনটাই মাটি!

সকাল থেকে অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়ছে। করপোরেশনের কর্তব্য-

পরায়ণতার দৌলতে সে বৃষ্টির জলের সাধ্য কি যে সহজে রাস্তা থেকে বেরোয়। ট্রাম বাস বন্ধ। কলকাতা প্রায় ভেনিস্ হয়ে উঠেছে বললেই হয়। এ হেন সন্ধ্যাটা মেসে বসে জমাবার জন্যে সন্ধ্যা থেকে ঘনাদাকে উস্কে দেবার কি চেষ্টাটাই না করা হয়েছে !

কিন্তু এ বাদলায় ঘনাদাও যেন বাসি মুড়ির মত মিইয়ে গেছেন।

যে-ঘনাদার কাছে তিল ফেলতে না ফেলতে তাল হয়ে ওঠে, জলের ছিটে পড়তে না পড়তে যিনি প্রলয় প্লাবনে আমাদের ভাসিয়ে দেন, সেই ঘনাদাকে আজ সন্ধ্যা থেকে একটু তাতিয়ে তুলতে পর্যন্ত পারা গেল না।

অথচ কোন অনুপানই বাদ পড়েনি।

ঘনাদাকে ধার দিতে দিতে শিশিরের সিগারেট কেস প্রায় খালি হয়ে এসেছে, শিবু ও রাম সেই যে নতুন মার্কিন 'সিগারেট লাইটার'টা তাঁর হাতে দিয়েছে, তা প্রায় বাজেয়াপ্ত হবার সামিল জেনেও এখনো পর্যন্ত একবার ফেরত চায়নি। মেসের ম্যানেজার আমাদের শাসনে ভুলেও একবার ছমাসের বাকি পাওনার কথা তোলেনি এবং আমরা সবাই টমটম চালান থেকে অ্যাটম বোমা পর্যন্ত হেন প্রসঙ্গ নেই যা ঘনাদার সামনে টোপ গিলতে তুলে ধরিনি।

কিন্তু আরাম-কেদারায়—কমন রুমের একমাত্র আরাম-কেদারায় সেই যে ঘনাদা গা এলিয়ে দিয়েছেন, তারপর তাঁকে একটু সোজা করে বসাতেও পারিনি।

মাছ ধরার প্রসঙ্গ দিয়ে শিবু অনুষ্ঠান শুরু করেছে। রাম তাতে ফোড়ন দিয়ে বলেছে, বর্ষার দিনে মাছ নাকি টোপ খায় ভাল।

কিন্তু মাছে টোপ খাক বা না খাক আমাদের টোপ বৃথাই নষ্ট হয়েছে। এমন কি কত বড় এক মহাশের একবার তার ছিপে উঠেছিল, গৌরাঙ্গ সগর্বে তা দুহাত ছড়িয়ে দেখিয়ে দেবার পরও ঘনাদার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি।

মহাশের থেকে ঘনাদা একেবারে দক্ষিণ মেরু সাগরে মহাতিমি শিকারের কথা তুলবেন এই আশাই আমরা করেছিলাম, কিন্তু তার বদলে তিনি ক্লান্ত-ভাবে শুধু একটু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েছেন।

মাছ থেকে আমরা পাহাড়ে ওঠার কথা তুলেছি। হাতের কাছে এমন একটা হিমালয় থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালীর ছেলেদের কেন যে পাহাড়ে চড়ার এতটুকু উৎসাহ ও যোগ্যতা নেই তা নিয়ে গৌরাঙ্গ দুঃখ প্রকাশ করেছে।

আমরা আড় চোখে চেয়ে দেখেছি ঘনাদা আরাম-কেদারার হাতলের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে আর একটু আয়েশ করে শুয়েছেন।

পাহাড়ে চড়া থেকে বন্দুক ছোঁড়া ও তা থেকে আবার ঘোড়ায় চড়ায় আমরা ঘুরে গেছি।

ঘনাদা সিগারেটে সুখ-টান দিয়ে চোখ দুটি মুদ্রিত করেছেন।

হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা ওয়েট-লিফ্‌টিং অর্থাৎ ওজন তোলার কথা পেড়েছি। বিজ্ঞানের নজির তুলে শিবু বলেছে—পোকামাকড়েরা যখন নিজেদের চেয়ে বহুগুণ ওজনের জিনিস তুলতে পারে, তখন মানুষেই বা পারবে না কেন?

প্রশ্নটা মাঠেই মারা গেছে।

ঘনাদা হাই তুলেছেন এবং আমরা এবার আশা ছেড়ে দিয়েছি।

মরিয়া হয়েই রাম বোধহয় শেষ চেষ্টা করেছে। কলা-কৌশল সব জলাঞ্জলি দিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছে—"আচ্ছা ঘনাদা, আপনি কখন ওয়েট-লিফ্‌টিং করেন নি?"

"ওয়েট-লিফ্‌টিং?"—ঘনাদা নেহাত আলস্যভরে বলেছেন—"না। ওয়েট লিফ্‌টিং করিনি। তবে একবার একটা পাথর তুলেছিলাম।"

আমরা একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে বসেছি। গৌরাঙ্গ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করেছে, "পাথর তুলেছেন! কত বড় ঘনাদা?"

আমাদের একেবারে দমিয়ে ধরাশায়ী করে ঘনাদা বলেছেন, "কত বড় আর ! এই এতটুকু হুড়ি—ছটাক খানেক ওজন হবে।"

আমাদের হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস শেষ হবার আগে ঘনাদা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে আবার বলেছেন, "মিকিউ দ্বীপটা তাতেই ত ফেটে চৌচির হয়ে গেল।"

"একটা দ্বীপ ফেটে চৌচির হয়ে গেল ! শুধু একটা হুড়ি তোলার জন্যে ?"—নিজেদের অজান্তে আমরা প্রশ্ন করে ফেলেছি।

ঘনাদা যেন অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন,—'হ্যাঁ, তাইতেই ফেটে চৌচির হয়ে সমুদ্রে ডুবে গেল।'

না, আর ঘনাদাকে উস্কানি দেবার দরকার হয়নি।

তিনি নিজেই এবার শুরু করেছেন।

'নিউ হেব্রাইডিজ্-এর নাম শুনেছিস্ কখনো ?'

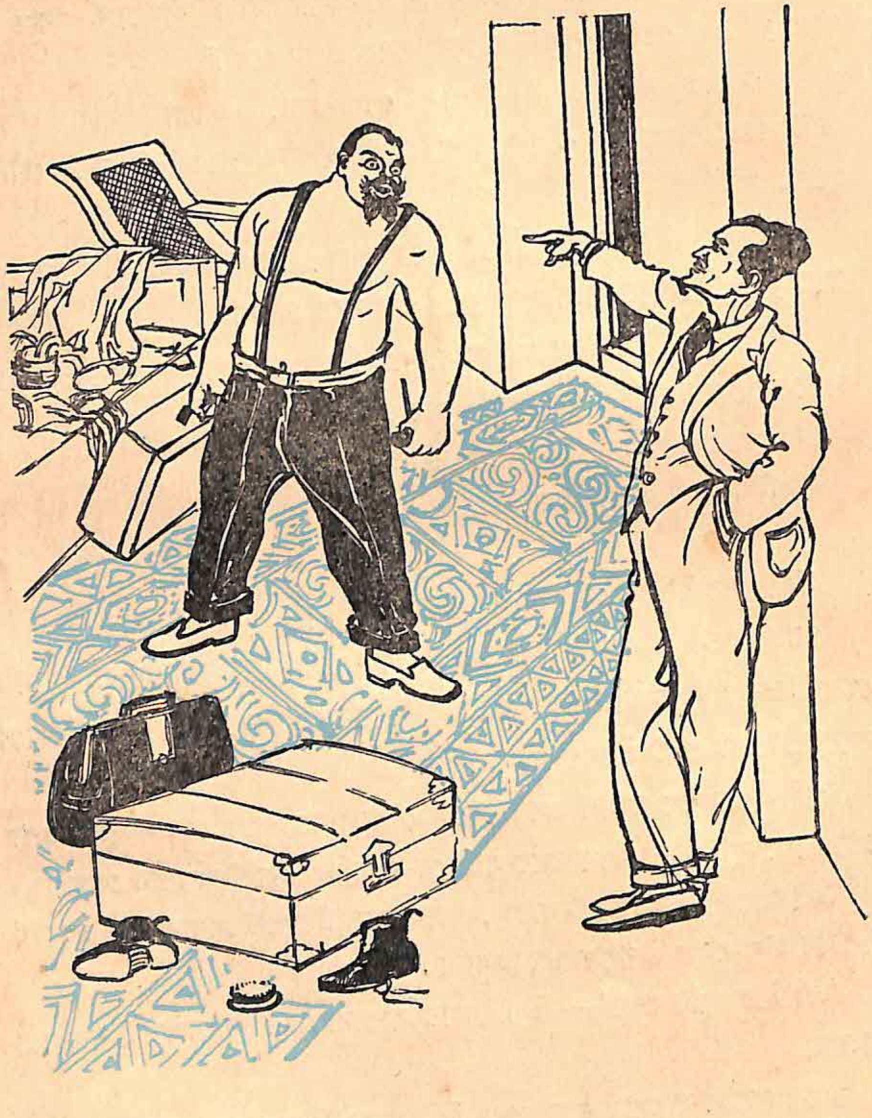
আর শুনে থাকলেও আসলে কি বস্তু বোধ হয় জানিস্ না। নিউ হেব্রাইডিজ্ হ'ল নিউজিল্যাণ্ডের ঠিক উত্তরে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পুব কোণে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপের জটলা।

পৃথিবীর মাইল পঞ্চাশ ওপর থেকে দেখলে মনে হবে যেন সমুদ্রের ওপর কটা পাথর কুচি ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে ইংরাজি 'ওয়াই' অক্ষরটা লেখা।

এই 'ওয়াই'-এর তিনটে হাতা যেখানে এসে মিলেছে সেখানকার 'এফাটা' দ্বীপটাই হ'ল সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী।

'এফাটায় হুটো বন্দর',—ভিলা আর হাভানা। ভিলা বন্দরেই সরকারী আস্তানা।

চন্দন কাঠের ব্যবসার জন্যে তখন নিউ হেব্রাইডিজের একেবারে দক্ষিণের 'আনিওয়া' নামে একটি দ্বীপে থাকি। সেখান থেকে সরকারী লাইসেন্স নেবার জন্যে ভিলা বন্দরে কদিনের জন্যে এসেছি।



সরকারী দপ্তরখানা সব দেশেই সমান। আঠারো মাসে তাদের বছর। নিউ হেব্রাইডিজে আবার এ বিষয়ে গোদের ওপর বিষফোঁড়া আছে। একা

রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব সেখানে দোসর। নিউ হেব্রাইডিজের রাজধানী এক কিন্তু রাজত্ব দুজনের। ইংরেজ আর ফরাসী এক সঙ্গে মিলে সেখানে শাসন করে। সুতরাং সাত দিনের কাজ সাত সপ্তাতেও সারা হ'ল না। ইংরিজি থেকে ফরাসী আর ফরাসী থেকে ইংরিজিতে তর্জমা হ'তে হ'তে আমার লাইসেন্সের আর্জি, কোন্ লালফিতের জালে যে জড়িয়ে পড়েছে তার হদিসই তখন পাচ্ছি না। ঠিক এই সময়ে মঁসিয়ে পেত্রার সঙ্গে আমার হঠাৎ আলাপ হয়। আলাপ হ'ল আশ্চর্য ভাবে। রাজধানী ও বন্দর হ'লে কি হয়, ভিলাতে ভালো একটা হোটেল নেই। মালানা নামে একটি দেশী লোকের টিনের চাল দেওয়া একটা মেটে দোতলার ওপরকার একখানা ঘর ভাড়া করে আছি। সেদিন সরকারী দপ্তরখানা থেকে যত অকর্মণ্য কর্মচারীদের সঙ্গে বচসা করে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরছি, এমন সময় ওপরে আমারই ঘরে তুমুল আন্দোলন হচ্ছে বলে মনে হ'ল।

নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে অত্যন্ত অবাক্ হয়ে ওপরে উঠে গেলাম। ঘরের দরজায় যাবার সময় আমি তালা দিয়ে গেছি নিজের হাতে। সে ঘরে গণ্ডগোল হয় কি করে!

সিঁড়ি দিয়ে উঠে মাঝখানের বারান্দাটুকু পার হবার আগেই মালানার সঙ্গে দেখা। আমার ঘর থেকে সে উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে আসছে। আমায় দেখতে পেয়েই সে হাত পা নেড়ে জানালে যে এখুনি আমাদের পুলিশে যাওয়া দরকার।

পুলিশে যাওয়া দরকার—কেন?

আর কেন? কোথাকার এক ফরাসী গুণ্ডা এসে আপনার ঘর দখল করেছে। আমি কত ঠেকাবার চেষ্টা করলাম, তা শুনলই না। জোর করে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকল। এখুনি আমি থানায় যাচ্ছি।

হেসে বললাম,—তার আগে লোকটার চেহারা একবার দেখা দরকার নয় কি!

মালানা সভয়ে বললে,—দেখবেন কি মশাই! সে একেবারে খুনে গুণ্ডা। কি করে বসবে ঠিক নেই।

হেসে বললাম,—আমি কি করব যখন ঠিক আছে তখন ভাবনা কি?

মালানা কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হয়ে ভয়ে ভয়ে আমার পিছু পিছু এল।

ঘরে ঢুকেই দেখি আমার জিনিসপত্র চারিদিকে ছত্রাকারে ছড়ান। তারই মধ্যে আমার ডেক-চেয়ারটিতে গা এলিয়ে দিয়ে বিশাল চেহারার একটি লোক নিশ্চিত আরামে পাইপ টানছে। পরনে একটা প্যাণ্ট ছাড়া তার কিছু নেই। গরমের দরুনই বোধ হয় গায়ের জামাজোড়া সব খুলে ফেলেছে। লোকটার গায়ের চামড়া শাদা এবং গোঁফ-দাঁড়ির ছাঁট দেখলে ফরাসী বলেই মনে হয়।

আমায় ঢুকতে দেখেই লোকটা ডেক-চেয়ারে উঠে বসে বাঘের মত ফরাসী ভাষায় হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"কে রে হতভাগা নিগার!"

মালানা ত সেই হুঙ্কার শুনেই তীরের মত ছিটকে গিয়ে পড়ল বারান্দায়। তারপর আর তার চুলের টিকি দেখা গেল না।

মুচকে একটু হেসে আমি একেবারে পরিষ্কার বাংলায় বললাম, চিনতে পারছ না সাহেব! আমি তোমার যম!

দুর্বোধ ভাষা শুনে আর আমায় হাসতে দেখে সাহেব একেবারে ক্ষেপে গেল। আমায় প্রায় কাঁচা-ই গিলে ফেলবে এমনি ভাবে দাঁত কড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠে এবার ইংরিজিতে বললে,—বেরিয়ে যা শীগগির কালা নেটিভ! নইলে তোর গায়ের সমস্ত চামড়া আমি খুলে নেব।

আগের মতই হেসে বললাম—বল কি সাহেব, আমার যে শুনেই গা সুড়সুড় করছে, কিন্তু তার আগে তোমায় যে একটু গা তুলতে হবে, এটা আমারই ঘর কিনা।

আমার মুখে চোস্ত জার্মান শুনে সাহেব প্রথমটা একেবারে থ' হয়ে

গেল। যাই হোক সাহেব একেবারে মুখ্‌খু নয়, জার্মান ভাষাটা অন্ততঃ বোঝে জেনে আমার একটু কৌতূহলও তখন বেড়েছে।

প্রথমে হতভম্ব হলেও পরমুহূর্তেই আমার কথার বিষটুকুর জ্বালাতে সাহেব একেবারে ফেটে পড়ল—এ ঘর তোমার? প্রমাণ কি তার?

আবার একটু হেসে আমার জিনিসপত্রগুলো দেখিয়ে দিয়ে বললাম,—প্রমাণ ত তুমিই ঘরময় ছড়িয়ে রেখেছ।

বটে!—বলে সাহেব হঠাৎ আমার স্যুটকেশটা ধরে বাহিরের বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—যাও, তোমার প্রমাণ ঘরের বার হ'য়ে গেছে। আর সুবুদ্ধি যদি এখনো না হয় তাহলে একটি লাথিতে তোমাকেও ওই প্রমাণের পিছু পিছু পাঠিয়ে দেব।

ঘরের মাঝখানেই সাহেবের প্রকাণ্ড কেবিন ট্রাঙ্কটা পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে বললাম,—সেটা একটু অভদ্রতা হয় না কি? তার চেয়ে বরং তুমিই পথ দেখো সাহেব, আমি তোমার মোট বইবার সমস্যাটা মিটিয়ে দিচ্ছি।

ট্রাঙ্কটা ছুঁড়ে বারান্দা পার করে নিচে ফেলে দিলাম।

সাহেব এক লহমা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে একেবারে তোপের গোলার মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জামাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে চেয়ে দেখি জানালার কাছে সচাপ্টে যেমন ভাবে পড়েছিল সাহেব সেইভাবেই শুয়ে আছে। নট্‌ নড়ন-চড়ন নট্‌ কিচ্ছু!

ঘরের কুঁজো থেকে তার মুখে জল ছিটিয়ে দিয়ে নিজেই এবার গিয়ে তুলে ধরলাম।

সাহেব হাঁফিয়ে উঠে বসে চোখ না খুলেই চেঁচিয়ে উঠল,—আমি মরে গেছি, নির্ঘাত মরে গেছি।

তাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম—হ্যাঁ, মরে তুমি নরকে এসেছ। যমরাজ তোমায় অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। চেয়ে দেখো!

সাহেব এবার চোখ খুলে তাকিয়ে বললে,—'অ্যাঁ—মরিনি তাহলে! কিন্তু আমার শিরদাঁড়া ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে!'

বললাম না, তাও হয়নি। উঠে দাঁড়াও দেখি।

সাহেব কিন্তু বসে বসে আমায় ভালো করে লক্ষ্য করে বললে,—তুমি কি জাপানী?

তারপর নিজে নিজেই আবার বললে,—উঁহুঃ, জাপানীদের চেহারা ত এরকম হয় না!

হেসে বললাম; আমি জাপানী নয়—বাঙালী। বাংলাদেশের নাম শুনেছ কখন?

বাংলা দেশ!—সাহেবের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল—বাংলা দেশের নাম শুনিনি আবার? তাগোরের সঙ্গে আমার এত আলাপ ছিল।

তাগোরের সঙ্গে! তাগোর আবার কে?

বাঃ—রাবীন্দ্রা নাত্ তাগোর!

বুঝলাম কবিগুরুর নাম ফরাসী উচ্চারণে এই রকম দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল? কোথায় আলাপ হয়েছিল?

একটু যেন ভড়কে গিয়ে সে বললে,—আলাপ মানে দেখাশোনা আর কি! পারিতে দেখাশোনা হয়েছিল।

বেশ একটু কড়াভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—কি সূত্রে?

সাহেব আরো আমতা আমতা করে বললে—মানে তিনি যখন ওখানে ছিলেন তখন কাগজে তাঁর ফটো দেখেছিলাম।

ধমক দিয়ে এবার বললাম,—দেখো সাহেব, আমার কাছে ওসব ধাপ্পা দিয়ে কোন লাভ হবে না। তোমার পাততাড়ি গুটিয়ে এঘর থেকে সরে পড়তেই হবে। নাও ওঠ।

সাহেব এবার রীতিমত কাঁদুনি গেয়ে উঠল—উঠব ত! কিন্তু যাবো কোন্ চুলোয় শুনি? পোড়া শহরে কি একটা হোটেল আছে? সারাদিন

ঘুরে একটা ঘরের বারান্দা পর্যন্ত ভাড়া পাইনি। আমি কি রাস্তায় গিয়ে শোব ?



এবার হেসে ফেলে বললাম,—আচ্ছা, আমার এখানে থাকতে পারো, কিন্তু বেচাল যেন আর না দেখি।

সাহেব নিজের গর্দানটায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে,—না, আমার গর্দানটা বীমা করা নেই।

মালপত্র নিচে থেকে তুলে এনে তারপর আমরা বেশ জমিয়ে বসে আলাপ শুরু করলাম। মঁসিয়ে পেত্রা আমারই মত ভবঘুরে লোক। ঝগড়া দিয়ে শুরু হওয়ায় এবং দুজনেই এক ধাতের লোক হওয়ায়, 'দোস্তি'-টা আমাদের খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আমি ইতিমধ্যে আমার চন্দন কাঠের ব্যবসার কথা বলেছি। মঁসিয়ে পেত্রা মাথা নেড়ে বলেছে,—ওসব চন্দন কাঠটাট্ কোন কাজের নয়, এ দ্বীপপুঞ্জের আসল মাল হ'ল গন্ধক! দেখো না এক বছরের মধ্যে এই গন্ধকের ব্যবসায় কি রকম লাল হয়ে যাই।

উদারভাবে পেত্রা তারপর আমাকে তার ব্যবসার ভাগীদার করতে রাজী হয়েছে। আমি হেসে বলেছি—আগে তুমি গন্ধকের খনি খুঁজে বার কর, তার পর দেখা যাবে!

পেত্রা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছে—ওঃ তুমি আমায় অবিশ্বাস করছ—পাগল ভাবছ আমায়! আচ্ছা দেখতে পাবে একদিন।

পেত্রার আস্ফালন যে একেবারে মিথ্যে নয় একদিন সত্যিই তার প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু সে প্রায় বছর ছয়েক বাদে। এই ছ বছর তার কোন খোঁজই রাখিনি বা পাইনি। ইভেটা দ্বীপে মালানার বাড়িতে আমার ঘরে দুদিন থাকবার পর হঠাৎ একদিন সকাল বেলা কিছু না বলে কয়ে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছল। একটু অবাক্ হ'লেও তার সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামাই নি। এ রকম খামখেয়ালী লোক দুনিয়ায় এ পর্যন্ত অনেক দেখেছি। বিকেলে কি করবে সকালে তারা নিজেরাই জানে না।

ছ বছর বাদে আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ! এবারও খুব অদ্ভুত ভাবে।

আনিওয়া দ্বীপে ফিরে এসে চন্দন কাঠের পেছনে তখনও লেগে আছি। কিন্তু ব্যবসা অত্যন্ত মন্দা। ফিজি দ্বীপের চন্দন কাঠ উজাড় করবার পর বেহিসাবী সদাগরেরা এই দ্বীপে হানা দিয়ে অবাধে যথেচ্ছভাবে চন্দন গাছ কেটে একেবারে সাবাড় করে দিয়েছে বললেই হয়।

ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে আবার কোথাও পাড়ি দেব কিনা ভাবছি এমন সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। আনিওলা দ্বীপের দক্ষিণ-পুব কোণে সমুদ্রের ধারের একটি ছোট গাঁয়ের সর্দারের বাড়িতে তখন আমি থাকি। কিছুদিন ধরেই গাঁয়ের লোকদের ভেতর একটা চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা লক্ষ্য করছিলাম। সেদিন তার কারণটা জেনে অবাক্ হয়ে গেলাম।

আমাদের গাঁ থেকে মাইল দশেক দূরে সমুদ্রের ওপর আর একটি ছোট দ্বীপ দেখা যায়। দ্বীপ না বলে তাকে সমুদ্রের ভেতর থেকে ওঠা একটা পাহাড় বলাই উচিত। যেদিকে যাও সমুদ্রের ওপর থেকে প্রায় খাড়া পাহাড়ের দেয়াল প্রায় দু' হাজার ফুট উঠে গেছে।

এ দ্বীপটিকে এ অঞ্চলের লোকে অপদেবতার বাসা বলেই জানে। জন-মনিষ্যি সেখানে থাকে না। শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখী সন্ধ্যার পর সেই পাহাড়ের নিচের দিকের খাঁজে ও পাথুরে তাকে রাত্রিবাস করতে নামে। দুঃসাহসী দু'চার জন দেশী লোক তাদের ভারা-ঝোলান 'কাটা মারান' নৌকোয় দিনের বেলা কখন সেখানে সেই পাখীদের আবর্জনা সার হিসেবে অত্যন্ত দামী 'গুয়ানো' সংগ্রহ করতে যায়। কিন্তু মরে গেলেও সেখানে রাত কাটায় না। এমন কি দিনের বেলাতেও পাহাড়ের ওপর কি আছে তারা কোনদিন সাহস করে চড়ে দেখে নি।

এই ভূতুড়ে পাহাড়ে কিছুদিন থেকে অপদেবতার উৎপাত নাকি আরো বেড়ে গেছে। 'গুয়ানো' কুড়োতে গিয়ে এক দলের জন ছয়েক নাকি আশ্চর্য ভাবে মারা পড়েছে। ওপর থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর ঠিক তাদের লক্ষ্য করেই কে গড়িয়ে দিয়েছিল। আরেক দল পাহাড়ের ওপর বিকট এক মূর্তি দিনের বেলাতেই দেখতে পেয়েছে।

এসব ছাড়া রাত্রে আজকাল পাহাড়ের ওপর এই গাঁ থেকেই অদ্ভুত ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা যায়, মাঝে মাঝে রহস্যজনক শব্দও সেখান থেকে ভেসে আসে।

পাছে পাহাড়ের অপদেবতার কোপ এই গাঁ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়, সেই ভয়েই গাঁয়ের লোক সারা। ভূতের ওঝারাও সময় বুঝে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে ব্যস্ত। অপদেবতাকে ঠাণ্ডা করবার কড়ার দিয়ে তারা ষোড়শোপচারে ভূত পূজোর আয়োজন করেছে।

সর্দারের কাছে ব্যাপারটা সব শুনে, আমি নিজেই পাহাড়ে দ্বীপে যাব ঠিক করলাম। সর্দারের নিষেধ মানা, উপরোধ অনুরোধ যদি বা কাটান গেল, দ্বীপে আমায় নৌকোয় পৌঁছে দেয় এমন লোকই পেলাম না গাঁয়ে।

অবশেষে রেগে ছোট একটা ডিঙি নিয়ে নিজেই একদিন বিকেলে দ্বীপের উদ্দেশে রওনা হলাম। সঙ্গে একটা ধারাল ছুরি। আর কুয়ো থেকে যা দিয়ে ডুবে-যাওয়া বালতি ঘড়া তোলে সেই রকম কাঁটার গোছা বাঁধা একটা লম্বা মজবুত দড়ি। রাত কাটাবার মত কিছু খাবার দাবারও সর্দার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল, যদিও রাত আমার সেখানে কাটবে কি না সে বিষয়ে তার ঘোরতর সন্দেহ।

আমার ডিঙি সমুদ্রে ঠেলে দেবার সময় সর্দার প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি! এতদিন এক সঙ্গে থাকার দরুন আমার ওপর এই সরল অসভ্য মেলানেশিয়ের সত্যি একটা মায়া পড়েছিল। এমন সাধ করে বেঘোরে মরতে যাওয়ায় তাই সে সত্যিই ব্যথা পেয়েছে।

একলা ডিঙি বেয়ে ভূতুড়ে পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে নিজেরও কাজটা একটু বেশীরকম গোঁয়ারতুমি বলে মনে হচ্ছিল। কোথায় কোন্ চুলোয় কি ভূতুড়ে কাণ্ড হচ্ছে, তাতে তোর মাথাব্যথা কেন বাপু! কিন্তু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাওয়াই যার স্বভাব তার উপায় কি!

ভূতুড়ে দ্বীপের ধারে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। সামুদ্রিক পাখীদের অধিকাংশই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ডানা গুটিয়ে তখন নিজেদের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। দু চারটে দেরি করে ফেরা পাখীর পাখার ঝটপটানি শুধু শোনা যাচ্ছে।

সুবিধেমত এক জায়গায় পাহাড়ের ধারে নৌকো বেঁধে ছুরিটা আর দড়ি বাঁধা কাঁটাটা নিয়ে তীরে উঠলাম। তীর মানেও পাথর। সে পাথরের তীর গজ কুড়ি পরেই খাড়া পাহাড়ের দেয়ালে শেষ হয়েছে। ছুরিটা কোমরে গুঁজে দড়ি বাঁধা কাঁটাগুলো ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। একবার ফস্কাবার পর ওপরের একটা খাঁজে কাঁটা আটকে গেল। ঠিক মত আটকেছে কিনা দড়ি নেড়ে একবার দেখে নিয়ে তাই বেয়ে সেই খাঁজের ভেতর পা দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর আবার কাঁটা ছুঁড়ে ওপরের কোন খাঁজে লাগাবার কসরত।

এমনি ভাবে প্রাণ হাতে করে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে যখন উঠলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। আমি পাহাড়ের পশ্চিম দিক্ দিয়ে উঠেছিলাম। সে দিকটা অন্ধকার হলেও ওপারে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী না পঞ্চমীর চাঁদের আলো পড়ে চারিদিক বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে।

সেই আলোয় সামনে যা দেখা গেল তাতে আমি সত্যি অবাক্! পাহাড়ের ওপরে ছোট একটি হ্রদ। নিচে থেকে এ জলাশয়টির কথা কল্পনাও করা যায় না। কেউ করেও নি এপর্যন্ত। সমস্ত পাহাড়টা যেন পেয়ালার মত এই হ্রদটিকে ওপরে তুলে ধরেছে।

নিঃসঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায় চাঁদের আলোর ঝলমলে হ্রদটিকে কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল, কি বলব!

দড়ি বেয়ে ওঠার পরিশ্রমে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। হ্রদের ধারে একটা পাথরের চাঁইএর পাশে বসে মুখ চোখে জল দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সমস্ত শরীর একমুহূর্তের জন্য কেমন যেন হিম হয়ে গেল।

হ্রদের ঠিক ওপারে জলের ভেতর থেকে সত্যিই একটা বিকট মূর্তি ওপরে উঠে আসছে। মূর্তিটা মানুষের মত সোজা হয়ে হাঁটছে—কিন্তু মানুষের সঙ্গে আর কোন সাদৃশ্য তার নেই। কবন্ধের মত বর্তুলাকার

বীভৎস একটা ধড় যেন ছুটো থামের ওপর দাঁড় করান—তার হাঁটার ভঙ্গীও এমন অমানুষিক যে আপনা থেকে সমস্ত শরীর শিউরে উঠে।



মূর্তিটা জল থেকে উঠে বিশ্রী টলমলে পায়ে তুলতে তুলতে ওপারের পাহাড়ের একটা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

না,—এ রহস্যের মীমাংসা না করলে নয়। মন শক্ত করে যথাসম্ভব সাবধান হয়ে হ্রদের পাড় দিয়ে ওপারে দৌড়ে গেলাম।

সামনে সুড়ঙ্গের মত সেই গহ্বর। একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করে ছুরিটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে তার ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। সুড়ঙ্গটা বেশী দীর্ঘ নয়, একটা বাঁক ফিরতেই দূরে একটা আলোকিত জায়গা দেখা গেল। এই কি তাহলে হ্রদের জলের সেই বিকট জীবের আস্তানা? আলো জ্বালবার ক্ষমতাও কি তার আছে!

সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সেখানে গিয়ে পৌছোলাম। সুড়ঙ্গটা এখানে একটা মাঝারি গোছের গুহায় শেষ হয়েছে।

গুহার ভেতরে পৌঁছে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সেখানে কেউ নেই, কিন্তু ঘরের এক পাশে একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে, দেয়ালে পোশাক-আশাক টাঙান।

এই ভূতুড়ে দ্বীপে এই দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় মানুষ এল কোথা থেকে! জলের তলা থেকে ওঠা সেই অমানুষিক জীবটিই বা গেল কোথায়!

অবাক্ হয়ে দেয়ালের ধারের পোশাকগুলো লক্ষ্য করছি এমন সময় সমস্ত গুহা কাঁপিয়ে সশব্দে একটা বন্দুকের গুলি আমার কানের পাশ দিয়ে দেয়ালে গিয়ে লাগল।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ছুরিও হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে ওধারের দেয়ালে বিঁধে গিয়ে কাঁপতে লাগল। যে বন্দুক ছুঁড়েছিল তার ডান হাতের জামার আস্তিন সেই ছুরিতে দেয়ালের সঙ্গে আঁটা হয়ে গেছে। হাত নাড়বার তার ক্ষমতা নেই।

লোকটার ওপর এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে বললাম—এ কি, মঁসিয়ে পেত্রা!

মঁসিয়ে পেত্রা করুণভাবে একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ, আপাততঃ তোমার বন্দী!

অর্ধেক রাত তারপর আমাদের পরস্পরের খোঁজ খবর নিতেই কেটে গেল। কি করে বন্দরের খোঁজে নানা জায়গা ঘুরে মঁসিয়ে পেত্রা শেষে

এই দ্বীপে উঠেছে, সব কাহিনী শোনার পর জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু জলের তলার সেই কিঁভূতকিমাকার জীবটি তাহলে কি ?

পেত্রা একটু হেসে আমায় নিয়ে গুহার একদিকের একটি পাথরের দরজা সরিয়ে অন্য একটা ছোট গুহায় নিয়ে গেল। পাথরের দরজাটি এমন কায়দায় বসান যে এমনিতে চোখে পড়ে না। আমারও চোখে পড়েনি।

ছোট গুহার ভেতরে ঢুকে সামনের দিকে আঙুল দেখিয়ে পেত্রা বললে, এই তোমার সেই বিকট জীব।

অবাক্ হয়ে দেখি সামনে দুটো ডুবুরীর পোশাক দেওয়ালের ধারে সাজান হয়েছে! পোশাক দুটি সাধারণ ডুবুরীর পোশাক থেকে একটু অবশ্য ভিন্ন ভাবে তৈরী।

পেত্রা নিজেই সে কথা আমায় জানালে—পোশাকগুলো আমি নিজেই ফরমাশ দিয়ে গড়িয়ে এনেছি।

কিন্তু কেন? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

কেন?—আচ্ছা দেখবে চল—বলে পেত্রা আমায় নিয়ে আবার সেই হ্রদের ধারে গিয়ে বললে, জলে এখন একটু হাত দাও দেখি।

হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বললাম,—একি, এত রীতিমত গরম! ঘণ্টা তিনেক আগেও ত ঠাণ্ডা দেখেছি!

পেত্রা থেমে বললে,—এইটেই এ হ্রদের রহস্য এবং তারই কিনারা করবার জন্যে এই ডুবুরির পোশাক। এ হ্রদ থেকে থেকে হঠাৎ এত গরম হয়ে ওঠে যে ওপারে ঝঞ্ঝার কুণ্ডলী উঠতে থাকে। এদেশে লোকেরা তাই দেখে ভাবে এখানে অপদেবতা আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি ডুবুরীর পোশাকে এ হ্রদের জলে নেমে কি পেয়েছ?

কি পেয়েছি, কাল ঠাণ্ডা হবার পর নিচে নামলেই দেখতে পাবে।



পরের দিন জল ঠাণ্ডা হ'তে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। ডুবুরীর পোশাক পরে আমরা তুজনে তারপর হ্রদের নিচে নামলাম। পাহাড়ের ওপার হ'লেও হ্রদটি খুব কম গভীর নয়। কিন্তু জল এমন পরিষ্কার যে দেখতে কিছু কষ্ট হয় না।

জলের তলায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আমরা একটা 'স্পিকিং টিউব' অর্থাৎ কথা কইবার রবারের নলের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম।

হ্রদের তলায় একজায়গায় এসে পেত্রা বললে,—নিচের দিকে চেয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

বললাম,—দেখতে পাচ্ছি ত নীলচে একরকম পাথর।

নীলচে পাথর নয়, পৃথিবীর সব চেয়ে দামী রত্ন হীরে যার মধ্যে পাওয়া যায় এ সেই পাথর।

হীরে !—উত্তেজিত ভাবে নিচের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে চমকে উঠলাম। নীলচে পাথরের গায়ে সত্যিই নানা জায়গায় আরেক জাতের পাথর এই জলের তলাতেও জ্বলজ্বল করছে।

হীরে ! চারিধারে এত হীরে ! এই হ্রদের মধ্যে ত সাতটা সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য তাহলে লুকোন রয়েছে। মনের ওপর যেন রাশ রচল না। ওরই ভেতর প্রকাণ্ড একটা জ্বলজ্বল পাথর দেখতে পেয়ে সেটা নেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠলাম। বাটালি গোছের একটা যন্ত্র পেত্রা সঙ্গে এনেছিল। সেটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে ধারের পাথর আলগা করে যখন সেটা তুললাম তখন অবাক্ হয়ে দেখি তার নিচে একটা নলের মত গর্ত বেরিয়ে পড়েছে এবং তার ভেতর দিয়ে হুহু করে জল গলে যাচ্ছে !

এই সামান্য ব্যাপারে পেত্রা কিন্তু হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। আমার আরো কয়েকটা হীরে সংগ্রহ করবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সে একেবারে পাগলের মত টানতে টানতে আমায় ওপরে নিয়ে গিয়ে তুলল। শুধু তাই নয়, ডুবুরির পোশাক ছেড়ে ফেলেই আমায় কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে টেনে নিয়ে গেল পাহাড়ের এক প্রান্তে। সেখান থেকে দড়ির একটি সিঁড়ি জলের ধার পর্যন্ত টাঙান এবং জলের ধারে পাহাড়ে একটি খাঁজের আড়ালে একটি ছোট মটর লঞ্চ দেখলাম লুকোন রয়েছে।

বড়ির সিঁড়ি দিয়ে মোটর গেটে নেমে সেটি চালিয়ে মাইল দশেক

দ্বীপটি থেকে দূরে যাবার আগে মুখে ফেনা উঠিয়েও পেত্রার কাছ থেকে একটা কথা বার করতে পারলাম না।

অবশেষে অত্যন্ত রেগে বল্লাম,—আমার কথার জবাব যদি না দাও তাহলে তোমায় বোট থেকে আমি সমুদ্রে ফেলে দেব—বুঝেছ! বল,—এ রকম ভাবে হঠাৎ পাগলের মত পালিয়ে আসার মানে কি?



মানে এখুনি বুঝতে পারবে। কাণে আঙুল দিয়ে শক্ত হয়ে বোটের রেলিং ধরে বোসো দেখি।

তার পরের কথা আর শুনতে পেলাম না। আমি দ্বীপটির দিকেই মুখ ফিরিয়েছিলাম। হঠাৎ আকাশ ফাটানো শব্দে সেই বিরাট পাহাড়ের দ্বীপটি তুবড়ির খোলের মত চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে গেল।

প্রলয়ের মত যে ঝড় তারপর উঠল, আর যে প্রচণ্ড ঢেউ এসে দৈত্যের মত কিছুক্ষণ আমাদের বোট নিয়ে লোফালুফি শুরু করলে, তাদের হাত থেকে বেঁচে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

এইবার পেত্রাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি বল ত পেত্রা!

ব্যাপার আর কি ? তোমার ওই হীরে তোলা ! ওই এক ছটাক একটা নুড়ি তোলাতেই এত বড় একটা দ্বীপ ফেটে চৌচির হয়ে গেল !

তা যাবে না !—পেত্রা বুঝিয়ে দিল—দ্বীপটা আসলে একটা আগ্নেয়গিরি ছাড়া কিছু নয়। ওপরে যে হ্রদ দেখেছি সেটা এককালে ছিল আগুন বেরুবার মুখ, এখন কোন রকমে বুঁজে গিয়ে বহুকালের বৃষ্টির জল জমে হ্রদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিচেকার আগুন যে এখনো নিভে যায় নি, জল মাঝে মাঝে গরম হওয়াতেই তা বোঝা যায়।

হ্রদের তলাটি খুব পুরু ত নয়। তুমি নুড়ি তোলার সঙ্গে সঙ্গে কোন গোপন ফুটো তাই সেখানে বেরিয়ে পড়ে। সেই ফুটো দিয়ে হ্রদের জল গভীর পাতালের প্রচণ্ড আগুনের ওপর গিয়ে পড়ে। সে জলের তারপর বাষ্প হয়ে উঠতে কতক্ষণ ! ওপরে ত সরু একটা ফুটো। বেরুবার পথ না পেয়ে সেই বাষ্প তাই ক্রমশ প্রচণ্ড বেগ পেতে পেতে গোটা পাহাড়টাকে ফাটিয়ে বেরিয়ে গেছে। ঐ নুড়িটুকু তুলেই দ্বীপটাকে তুমি ডোবালে !

ঘনাদার গল্প শেষ হ'লে গৌরাঙ্গ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে,—দ্বীপটার নাম কি ছিল ঘনাদা ?

ঘনাদা বিরক্ত হয়ে বললেন,—যা ডুবে গেছে তার নামে কি দরকার ?

আর সেই ছটাক খানেক হীরেটা ?—শিবু জিজ্ঞাসা করলে,—সেটা নিশ্চয় হাতছাড়া করোনি।

ঘনাদা হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। শিবুর কথাটা বোধ হয় তাই কানে গেল না।

—



কাঁচ

ঘনাদা কোথায় !

কোথায় গেলেন ঘনাদা !!

সবাই মিলে সারাদিন যাঁকে চোখে চোখে পাহারায় রাখা হয়েছে এই ভর সন্ধ্যের সময় সকলকে ফাঁকি দিয়ে তিনি কোথায় পালালেন,—এবং কেমন করে !!!

নিচে ওপরে ছাদে পর্যন্ত আমরা সবাই ঘুরে এলাম। কোথাও ঘনাদার চিহ্ন নেই।

সত্যিই কি ঘনাদা তাঁর গল্পের বাহাত্বরীর খেল আমাদের প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিলেন ?

তেতলার ছাদ থেকে লাফিয়েই পড়লেন আমাদের এড়াতে ?

আমাদের এড়াতে চাইবার কারণ একটা অবশ্য ছিল, কিন্তু সত্যি, সেটা ঘনাদার কাছে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করবার মত গুরুতর হতে পারে তা আমরা ভাবিনি।

আমরা শুধু একটা মজাই করতে চেয়েছিলাম ঘনাদাকে নিয়ে।

ফন্দিটা শিবুর। ঘনাদা সেদিন তাঁর মৌরসী পাট্টা করা আরাম কেদারায় বসে শিশিরের সিগারেটের টিনের সদ্ব্যবহার করতে করতে আমাদের দু চারটে খোশগল্প শোনাচ্ছেন, এমন সময় শিবু যেন অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে বললে, এই যে ঘনাদা ! আপনাকেই খুঁজছিলাম।

শিবুর কথার ধরনে আমরা একটু অবাক্ হয়েই তার দিকে তাকালাম। ঘনাদাই নিজের দরকারে যথাসময়ে আমাদের খুঁজে বার করেন, এক গল্প শোনা ছাড়া তাঁকে গরজ করে খোঁজবার কারণ আর কিছু ত কখন দেখা যায় নি !

ঘনাদার পাশেই একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে শিবু বেশ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—কাল বিকেলে আপনার তেমন জরুরী কোন কাজ আছে নাকি !

আমরা এবার অতিকষ্টে হাসি চাপলাম। ঘনাদার কাজ ! এতবড় আজগুবি কথা কখনও আমরা শুনিনি।

ঘনাদা শিবুর প্রশ্নে বোধহয় আমাদের মতই হতভম্ব হয়েছিলেন কিন্তু বাইরে দস্তুর মত গম্ভীরভাবে বল্লেন, কাল বিকেলে ? দাঁড়াও···কমিশনারের সঙ্গে একবার···প্রিমিয়ারকে একটা ফোন···

মনে মনে সশব্দে ঘনাদা যা আওড়ালেন তাতে বোঝা গেল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চার্চিল সাহেবকেও একদিনে এতগুলো দায় একসঙ্গে সামলাতে হয়নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিবুর ওপর সদয় হয়ে বল্লেন,—তা খানিকক্ষণ সময় হতেও পারে, কিন্তু কেন বলত ?

না এমন কিছু না। আমাদের Athletic clubএ কাল একটা ব্যাপার আছে কিনা, তাতে আপনাকে একটু থাকতে হবে।

ঘনাদার মুখ তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিবুদের ক্লাবে এর আগে একবার তাঁর যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে শরীর-

চর্চা যতটা না হোক, এসমস্ত অনুষ্ঠানে ভোজটা বেশ জমকালো রকমেরই হয়। ঘনাদা উৎসাহটা যতদূর সম্ভব লুকোবার চেষ্টা করে বললেন,—তা বলছ যখন এত করে, তা না হয় যাব'খন। কিন্তু কি ব্যাপারটা বলত ?

একটা 'বক্সিং কন্টেস্ট'—মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা—আপনাকে সালিশী অর্থাৎ রেফারীর কাজ করতে হবে।

মুষ্টিযুদ্ধ শুনে ঘনাদার মুখে যেটুকু ছায়া নেমে এসেছিল, রেফারীগিরি শুনেই সেটুকু কেটে গেল। বললেন,—রেফারী হতে হবে। বেশ বেশ! তা ভালো রেফারী বুঝি আর কাউকে পেলে না!

পাব না কেন ?—শিবু গম্ভীরভাবে বললে, কিন্তু এবারে একটু ফ্যাসাদ আছে কিনা! জানাশোনা রেফারীরা কেউ রাজী হচ্ছে না!

কেন বলত ?—ঘনাদার ভ্রূ একটু কুঞ্চিত মনে হ'ল।

ব্ল্যাক টাইগারের নাম শুনেছেন কিনা জানি না, মিশকালো নিগ্রো, বক্সার—আর একেবারে বাঘের মতই হিংস্র। মাসখানেক হল কলকাতায় এসেছে। তার সঙ্গে আমাদের ওয়েলটার ওয়েট চ্যাম্পিয়ন সুরজিৎ দাসের লড়াই কিনা!

তাতে রেফারীর ভয়টা কিসের ?—আমরাই জিজ্ঞাসা করলাম।

ব্ল্যাক টাইগারের পরিচয় তাহলে জানো না মনে হচ্ছে—শিবু আমাদের দিকে একটু অনুকম্পাভরেই তাকাল,—এ পর্যন্ত পাঁচজন রেফারীকে সে হাসপাতালে পাঠিয়েছে, একজন ত আর ফেরে-ই নি। একটু মেজাজ বিগড়োলে কে রেফারী আর কে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তার হুঁশই থাকে না।

শিবু ঘনাদাকে লুকিয়ে আমাদের দিকে যৎসামান্য একটু চোখ টিপতেই ব্যাপারটা আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না।

শিশির ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা করলে,—তা এ রকম খুনেদের আসরে ঘনাদাকে রেফারী করা কেন বাপু!

বাঃ ঘনাদার মত রেফারীই ত দরকার। য়েফারীকে রেফারীগিরিও করবে,

আবার ‘কালা বাঘ’ কিছু বেয়াড়াপনা করলে একটি ‘অপারকাট’-এ তাকে শায়েস্তাও করতে পারবে! বলুন না ঘনাদা, সেই ব্যাট্‌লিং মিকিকে আপনি শুধু স্ট্রেট্ লেফ্‌টে কি রকম নাজেহাল করেছিলেন!

অন্যদিন হলে ঘনাদাকে আর দুবার বলতে হ’ত না, কিন্তু সেদিন মেজাজটা তাঁর কেমন বিগড়ে গেছে বলে মনে হল। বিরসভাবে একটু হেসে তিনি হঠাৎ উঠে পড়লেন।

গৌর অবাক্ হবার ভান করে জিজ্ঞাসা করলে,—ওকি, উঠলেন কেন? কাল রেফারী হবেন ত?

ঘনাদা কিছু বলবার আগেই শিবু বলে উঠল,—আরে ওকথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়। এমন একটা সুবিধে ঘনাদা ছাড়েন কখনো। কাল তাহলে সন্ধ্যে ছ’টায় ঠিক রইল।

ঘনাদা কি একটা যেন বলতে গিয়ে না বলে বেরিয়ে গেলেন।

ওপরের সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর আমাদের ঘর হাসির রোলে ফেটে যাবার উপক্রম।

তারপর আজ সেই সন্ধ্যে থেকে ঘনাদাকে খুঁজছি!

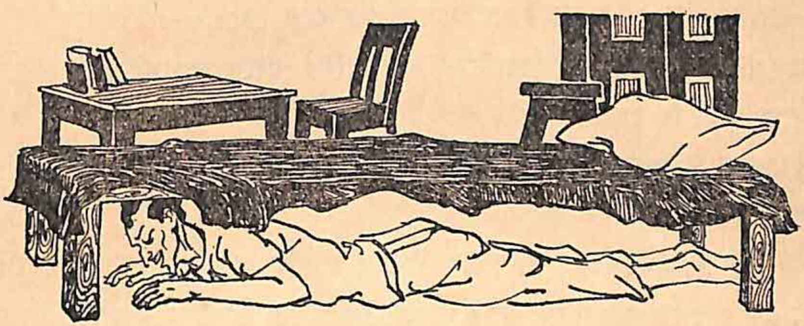
হঠাৎ অদৃশ্য না হলে ঘনাদা যে আমাদের সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন না এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহলে তিনি গেলেন কোথায়!

শিবুর সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। ঘর দোর ছাদ থেকে বাথরুম পর্যন্ত সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে হতাশ হয়ে সে হঠাৎ বললে—আচ্ছা, খাটের তলাটা ত দেখা হয়নি।

আমরা হেসে উঠে আপত্তি জানালাম। আর যেখানে হোক খাটের তলায় গিয়ে ঘনাদা লুকিয়ে থাকবেন, এটা কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু ঘরে ঢুকে খাটের তলায় উঁকি মেরে সত্যিই থ হয়ে গেলাম। ঘনাদা খাটের তলায় মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন।

সে দৃশ্যটা ভোলবার নয়। খাটের তলায় ঘনাদা আর বাইরে আমরা বিমূঢ় হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। আমরা ত এমন হতভম্ব যে হাসতে পর্যন্ত ভুলে গেছি।



ঘনাদা কিন্তু সেই অবস্থাতেও এক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এমনভাবে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন যেন খাটের তলায় শুয়ে থাকাটা তাঁর একটা স্বাভাবিক নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস।

এতক্ষণে আমাদের মুখে কথা ফুটল।

ব্যাপার কি ঘনাদা! এমন সময়ে খাটের তলায়—জিজ্ঞাসা করলে শিশির।

ঘনাদা কিছু না বলে গম্ভীরভাবে শুধু ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। হাতে যা ররেছে সেটা একটা চশমার কাঁচ বলেই মনে হল!

এতক্ষণ ধরে খাটের তলায় ওই একটা ভাঙা কাঁচের টুকরো খুঁজছিলেন! —আমি না বলে পারলাম না!

তার উত্তরে ঘনাদা নাকের ভেতর দিয়ে যে শব্দটা বার করলেন, তার অর্থ বিরক্তি অধৈর্য অবজ্ঞা সবই একসঙ্গে হতে পারে। তারপর শব্দটাকে

ভাষায় রূপ দিয়ে আমাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,—একটা ভাঙা কাঁচের টুকরো—কেমন ?

গতিক সুবিধে নয় দেখে শিবু তাড়াতাড়ি বললে, ওদিকে বক্সিং কিন্তু শুরু হয়ে যাবে··· ।

আর বক্সিং ! ঘনাদার গল্প তখন শুরু হয়ে গেছে,—এই ভাঙা কাঁচের টুকরোটি না থাকলে হিরোসিমা নাগাসাকির বদলে লণ্ডনেই প্রথম অ্যাটম বোমা পড়ত তা জানো !

জানবার আমাদের দরকার নেই ;—শিবু দুর্বলভাবে শেষ চেষ্টা করে বললে,—এখন আপনি চলুন ত !

এই যে যাই, বলে খাটের ওপরই বেশ আরাম করে বসে ঘনাদা বললেন, ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ! তারিখটা তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় । যে মহাযুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী রক্তে ভেসে গেল তার প্রথম স্ফুলিঙ্গ সেইদিন জার্মানী আর পোল্যাণ্ডের সীমান্তে জ্বলে উঠেছিল। হিটলারের দুরন্ত বাহিনী সেদিন পোল্যাণ্ডের ওপর বন্যার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর আমি বেঙ্গুয়েলা বন্দর থেকে ছ্যাকড়াগাড়ির মত এক ট্রেণে চেপে অ্যাংগোলার মাছামাঝি কোয়াঞ্জা স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। আমার লক্ষ্য অবশ্য কোয়াঞ্জা স্টেশন নয়। সেখানে নেমে কুয়াঞ্জা নদীর যেখানে উৎস সেই বিহে পাহাড়েই যাবার জন্যে আমি বেরিয়েছি ।

একটু হেসে আমাদের মুখের ভাবগুলো একটু লক্ষ্য করে ঘনাদা বললেন, —ভূগোলের পরীক্ষার মত লাগছে বুঝি । বুঝিয়ে বলছি দাঁড়াও । অ্যাংগোলার নাম নিশ্চয় শুনেছ। না শুনে থাকলে আফ্রিকার ম্যাপ্‌টা একবার খুলে দেখো। তলার দিকে পূবের আতলান্তিক মহাসাগরের ধারে একটা সবুজ রঙে ছাপা দেশ পাবে। দেশটা পর্তুগীজদের দখলে কিন্তু রেলটা ইংরেজদের ; আর ওই রেলপথ আর সমুদ্রের ধারের কিছু কিছু জায়গা ছাড়া ভেতরের অধিকাংশ পাহাড় জঙ্গল মরুপ্রান্তর এখনো প্রায় অজানা

বললেই হয়। সেখানে বান্টু নিগ্রো জাতের কাফ্রীরা একরকম স্বাধীন ভাবেই থাকে।

রেলের যে কামরাটায় উঠেছিলাম সেটা প্রথম শ্রেণীর। নোভা লিস্‌বোয়া স্টেশন পর্যন্ত একাই বেশ আরামে সেটায় কাটালাম। নোভা লিস্‌বোয়াতে নতুন দুজন যাত্রী উঠল। সারা রাস্তা একলাই একটা কামরা দখল করে যেতে পারব এ আশা করিনি, কিন্তু নতুন সঙ্গী দুজন অমন বেয়াড়া অভদ্র না হলে ভালো হত। কথাবার্তা ও চেহারা দেখে গোড়াতেই বুঝেছিলাম তাদের দুজনেই জার্মান। অ্যাংগোলা পর্তুগীজদের দখলে হলেও জার্মানদের আনাগোনা এখানে কিছুদিন ধরে খুব বেড়েছে জানতাম। শুধু নতুন নাৎসী তেলক কেটে তারা যে এখন সাপের পাঁচ পা দেখেছে তা জানা ছিল না।

নতুন যাত্রীদের লটবহর বড় বেশি। বড় বড় চটে মোড়া থলি প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি এক গাড়ি মাল ব্রেকভ্যানে না দিয়ে কামরায় তোলাই অন্যায়। তবু গোড়ায় তা নিয়ে কোন প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু জার্মান যাত্রীদের অভদ্রতা ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে গেল। একটি কেবিনট্রাঙ্ক ও একটি হোল্ডঅল ছাড়া আমার সঙ্গে কিছু নেই। কেবিনট্রাঙ্কটা বাঙ্ক-এর ওপর রেখে হোল্ডঅলটা খুলে তার ওপর শুয়ে শুয়ে আমি নতুন যাত্রীদের মাল তোলা দেখছিলাম, হঠাৎ একজন আমায় অসভ্যের মত যা হুকুম করলে আমাদের ভাষায় অনুবাদ করলে তার অর্থ দাঁড়ায়,—এই কালাভূত, তোর মোট সরা এখান থেকে !

যেন কিছুই বুঝিনি এইভাবে লোকটার দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইলাম। দুজনের মধ্যে এই লোকটাই দেখলাম বেশী জোয়ান। ছ'ফুট লম্বা, পাক্কা আড়াই মণ লাশ।

আমায় নড়তে না দেখে একটা গালাগাল দিয়ে লোকটা আমার হাত ধরে হেঁচকা টান দিয়ে বললে, শুনতে পাচ্ছ না জানোয়ার কোথাকার! একটি বুটের ঠোকরে একেবারে গাড়ির বাইরে ফেলে দেব।

যেন কিছুটা বুঝতে পেরেছি এমনি ভাবে বোকার মত উঠে দাঁড়িয়ে কেবিনট্রাঙ্কটা টেনে নামিয়ে নিচে ফেললাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় তার ডান পা-টা সেইখানেই ছিল। ট্রাঙ্কটাও বেশ ভারী। পায়ের যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে



নেংচাতে নেংচাতে লোকটা প্রথম মিনিট কয়েক ত আমার চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করলে। তারপর বুনো গণ্ডারের মত তেড়ে এল আমার দিকে।

এবার একটা সিগারেট ধরালাম।

লোকটা তখন ডিগবাজি খেয়ে তার সঙ্গীর ঘাড়েই গিয়ে পড়ে দুজনে মিলে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

কয়েক সেকেণ্ড হতভম্ব হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দুজনে গা ঝেড়ে উঠে ঘুষি বাগিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, এমন সময় দরজা থেকে শোনা গেল,—আরে আরে হের ডস্ নাকি!

তিনজনই অবাক্ হয়ে সেদিকে চাইলাম।

ট্রেণ তখন ছেড়ে দিয়েছে। কামরার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিপের মত

গোল বেলের মত চাঁছামাথা মাঝবয়সী যে জার্মান ভদ্রলোকটি আমাদের দিকে এগিয়ে এলো, প্রথমটা তাকে সত্যিই চিনতে পারিনি।

আমাদের কাছাকাছি এসে, মারমূর্তি তার দুটি সঙ্গীর দিকে চোখ পড়তে একটু অবাক্ হয়ে সে বললে,—ব্যাপার কি হে! তোমরা লড়াই করছিলে নাকি!

এবার দুজনের মুখে খানিকক্ষণ খই ফুটল যেন। কালা আদমির কাছে জব্দ হয়ে গায়ের জ্বালা মুখের তোড়ে বার করতে তারা কিছু বাকি রাখলে না।

তাদের কথা শেষ হবার পর বেলের মত তেলা মাথা জার্মানের সে কি হাসি। পিপের মত ভুঁড়ি তার ফেটে যায় আর কি!

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে সে বললে, তোমরা আর ঝগড়া করবার লোক পাওনি!

আমার দিকে ফিরে তারপর বললে,—কিছু মনে কোরো না হের ডস্, এরা সেদিনের ছোকরা, তোমার পরিচয় কোথা থেকে জানবে!

হেসে আবার বললেন,—আমায় চিনতে পারছ ত? চিনতে আমি তখন পেরেছি। মাথার শেষ কগাছি চুল উঠে গেলেও এবং ভুঁড়িটি বেশ কয়েক ইঞ্চি বাড়লেও আগেই তাকে আমার চেনা উচিত ছিল। দুনিয়ার পাণ্ডব-বর্জিত সব দুর্গম জায়গায় প্রাণ হাতে নিয়ে দুর্লভ ধাতুর খোঁজে যারা ঘুরে বেড়ায়, ফন্দিবাজ প্যাপেনকে তারা সবাই চেনে। অমন একটি ধূর্ত শয়তান এ লাইনে আর দুটি নেই। আমার সঙ্গে দু'চারবার তার ঠোকাঠুকি আগেই হয়ে গেছে বলেই আমার অত খাতির তার কাছে। শুধু দেশ দেখার জন্যে এত লটবহর নিয়ে প্যাপেন যে এই জঙ্গল মরুভূমির দেশে আসেনি তা বুঝতে পারলেও মুখে অমায়িক হেসে আমি তার হাত ঝাঁকানি দিলাম।

এইবার শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি শুরু হল। আমি প্যাপেনকে দেখে যতটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছি, প্যাপেনও আমাকে দেখে তার চেয়ে বেশি বই কম

নয়। এখন কে কৌশলে কার পেট থেকে কথা বার করে নিতে পারে তারই প্যাঁচ কষাকষি চলল। আমার পাশে বসে প্যাপেন এমন অন্তরঙ্গের মত গল্প শুরু করলে যেন কোন রেষারেষি আমাদের মধ্যে নেই। দুজনের কেউই কম যায় না। ঘণ্টা দুয়েক সমানে নানান কায়দা করেও কেউ কারুর মুখ থেকে একটা বেফাঁস কথাও বার করতে পারলাম না। বাঁকা রাস্তায় সুবিধে করতে না পেরে প্যাপেন হঠাৎ হেসে উঠে সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করে বসল, আর লুকোচুরিতে লাভ নেই। সত্যি করে বলত ডস্, কোথায় চলেছ ?

হেসে বললাম,—হয়ত সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে!

আমার সঙ্গে দেখা ! প্যাপেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, - আরে আমি ত যাচ্ছি একেবারে অ্যাংগোলার শেষ প্রান্তে লুয়াও স্টেশনে।

তাই নাকি !—হেসে বললাম, মালপত্র দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে।

আরে ওসব মালপত্র ত লুয়াও-র এক হাসপাতালের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। আজকাল আর পাহাড়ে-পর্বতে সোনা রুপো খুঁজে বেড়াবার মত শরীরের সামর্থ্য নেই, তাই এই সব মাল যোগাবার কাজ নিয়েছি।—প্যাপেন আমাকে একেবারে জল বুঝিয়ে দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে,—কিন্তু তুমি কোথায় নামবে তা ত বললে না !

আগের মতই হেসে বললাম,—যেখানেই নামি, দেখা আমাদের যথাস্থানে হবে বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ প্যাপেন গম্ভীর হয়ে বললে,—দেখা কিন্তু এবার আমাদের না হ'লেই ভাল হত।

কেন বলত !—একটু বিদ্রূপের সঙ্গেই বললাম, এবার থার্ড রাইখ্ অর্থাৎ নাৎসী জার্মানীর হয়ে টহল দিতে বেরিয়েছ বলে ?

খানিক চুপ করে থেকে প্যাপেন তেমনি গম্ভীরভাবে বললে,—হ্যাঁ, তাই যদি বলি !

তাহলে বলব নাৎসীদের সে চরেদের দৌড় কত একবার দেখে মরতে চাই।

বাকি দুজন জার্মান গোঁজ হয়ে অন্য এক বেঞ্চিতে বসে এতক্ষণ কান খাড়া করে আমাদের আলাপ শুনছিল। আর থাকতে না পেরে তাদের একজন দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল—তোমার বাসনা অপূর্ণ থাকবে না।

তার দিকে ফিরে একটু হাসলাম। কদিন বাদে তার অভিশাপ সত্যিই ফলবার উপক্রম হবে তখন ভাবিনি।

* * *

দিন পনরো পরের কথা। বিহে অধিত্যকায় একটা খাড়া পাহাড়ের চূড়ার নিচে তাঁবুর মধ্যে বসে লণ্ঠনের আলোয় সে অঞ্চলের একটা ম্যাপ আঁকছিলাম। অন্ধকার রাত, চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। সারাদিন দক্ষিণ-পূর্ব মুখে যে ঝড়ের মত হাওয়া বয়েছে তাও এখন যেন ক্লান্ত হয়ে থেমে গেছে।

ম্যাপ আঁকায় খুব যে আমার মন ছিল তা নয়। থেকে থেকে কান খাড়া করে যা শোনবার চেষ্টা করছিলাম হঠাৎ তার আভাস পেয়ে ম্যাপের ওপর নিবিষ্টভাবে ঝুঁকে পড়লাম। একটু পরেই ভারী গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম—একি এখানেও হের ডস্ যে!

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি প্যাপেন ও তার দুই সঙ্গী যথাসম্ভব নিঃশব্দে আমার তাঁবুর মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারাদিন পাহাড়ের চূড়া থেকে লটবহর ও কুলির দল নিয়ে দূর থেকে তাদের আসা যে আমি লক্ষ্য করেছি, তাদের আসার জন্যেই যে এমন করে আসর সাজিয়ে বসে আছি একথা ঘুণাক্ষরে বুঝতে না দিয়ে অত্যন্ত অবাক্ হবার ভান করে বললাম,—তাই ত, সত্যিই আমাদের আবার দেখা হ'ল দেখছি।

হুঁ, কিন্তু না হলেই ভালো হত।—প্যাপেনের মুখ রীতিমত গম্ভীর।

কেন বল ত! এ পাহাড়ে সোনাদানা যা আছে তাতে আমি আর কতটুকু ভাগ বসাতে পারব। তোমাদের যত খুশি নাও না।

সোনাদানার খোঁজে আমরা আসিনি, আর তুমিও না—প্যাপেন বেশ একটু রাগের সঙ্গেই বললে,—সোনাদানার জন্যে কেউ 'গেগার কাউণ্টার' সঙ্গে আনে না।

মেঝের ওপর 'গেগার কাউণ্টার'টা যেন সেইমাত্র চোখে পড়ল, এইভাবে বললাম,—তাই ত গেগার কাউণ্টারটা ভুলে সঙ্গে এনেছি দেখছি। ইউরেনিয়াম রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর খোঁজে এ যন্ত্রের দরকার হয় শুনেছি।

আমার বিদ্রূপে এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে প্যাপেন বললে,—তুমি সেই খোঁজেই এসেছ আমরা জানি। কিন্তু এ সন্ধান তোমায় ছাড়তে হবে।

কেন, নাৎসী জার্মানীর হয়ে শুধু তোমরাই সে সন্ধান করবে বুঝি?

হ্যাঁ, আমরাই করব। এ পাহাড়ে যে ইউরেনিয়াম-ঠাসা পিচব্লেণ্ডের শিরা আছে সে খবর পেয়েই আমরা এসেছি। শুধু তুমি কোথা থেকে এ খবর পেলে বুঝতে পারছি না।

একটু হেসে বললাম,—নাৎসীদের ওপর কেউ টেক্কা দিতে পারে তা সহজে বিশ্বাস হয় না, না?

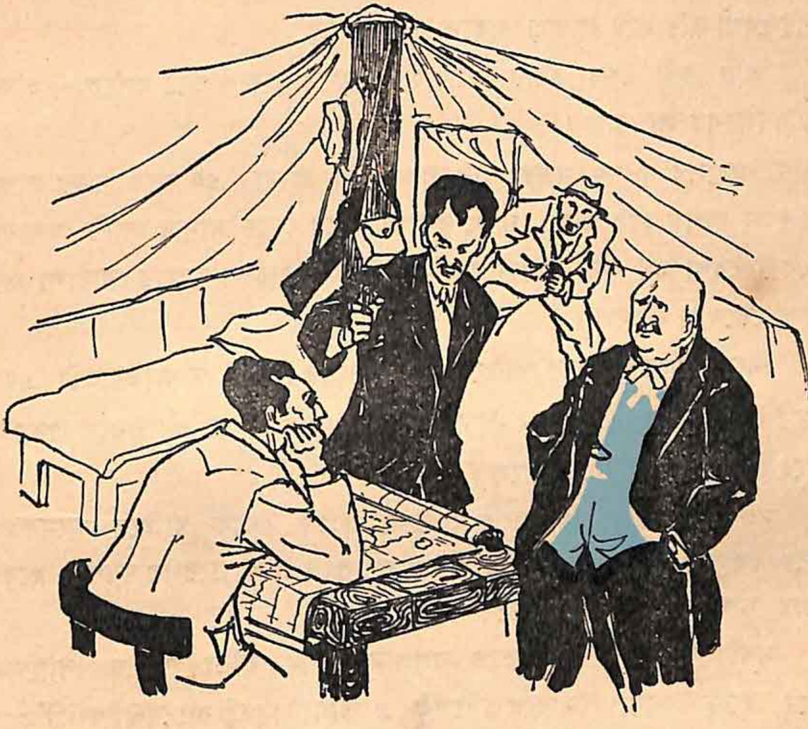
যার পায়ে কেবিনট্রাঙ্ক পড়েছিল সে-ই এবার হুংকার দিয়ে উঠল,—নাৎসীদের ওপর টেক্কা দিতে চেষ্টা করলে কি হয় এখুনি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব।

হেসে বললাম, তার আগে একটা কথা বুঝিয়ে দিলে খুশি হতাম। নাৎসী জার্মানীর হঠাৎ ইউরেনিয়ামের ওপর অত ঝোঁক পড়ল কেন?

এবার প্যাপেনের সঙ্গী দুজন হেসে উঠল। তারপর ঘৃণাভরে বললে, তোমরা যার গোলাম সেই ইংরেজ জাতকে তাদের দ্বীপ সমেত একেবারে নস্যি করে শূন্যে মিশিয়ে দেবার জন্যে।

প্যাপেন বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ছোকরাদের মুখ তখন খুলে গেছে।

থামায় কার সাধ্য। উত্তেজিতভাবে বলে চলল,—রেডিয়াম থেকে শুধু সামান্য দুএকটা রোগ সারাবার ছেলেখেলাই এতদিন দেখেছ, জার্মানী



এবার এমন কিছু তা থেকে তৈরি করবে, দশ হাজার বজ্র যার কাছে পট্‌কাবাজি।

সত্যিই অবাক্ হয়ে বললাম,—যে অ্যাটম-বোমা এতদিন শুধু কল্পনাতেই ছিল, নাৎসীরা তা তৈরি করবে!

হ্যাঁ, আর সেই জন্যেই এ তল্লাটে আর কোন ভাগীদার আমরা সহ্য করব না। সুবোধ ছেলের মত তোমায় ঘরে ফিরতে হবে।

যদি না ফিরি—বলার সঙ্গে সঙ্গে হুটো পিস্তল আমার দিকে উঁচু হয়ে উঠল।

পায়ে চোট খাওয়া জার্মান জোয়ান মুখ বেঁকিয়ে বললে, ভালোয় ভালোয় এই বেলা যদি সরে না পড় তাহলে···

তার কথা শেষ হবার আগেই প্যাপেন চমকে উঠে বললে,—ওকি! ওটা কিসের আওয়াজ!

পিস্তলের দিকে নজর থাকলেও কান আমার এই আওয়াজের জন্যেই এতক্ষণ সজাগ হয়ে ছিল। যাক্, কুয়াঙ্গা শহরে নেমে আমার অতি মূল্যবান একটি বেলা নষ্ট করা বিফল হয়নি। আমার পুরনো অনুচর নোয়ালা তার কথা রেখেছে তাহলে।

নিস্তব্ধ রাতের বুকের স্পন্দনের মত সুদূরের ড্রিম ড্রিম আওয়াজটা এবার স্পষ্ট শোনা গেল। প্যাপেন কাঁচা আনাড়ি লোক নয়। আফ্রিকায় এতকাল ঘুরে এ শব্দের ভাষা সে বোঝে।

সঙ্গীদের একজন কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে ধমকে থামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একমনে সে একটানা সমস্ত শব্দগুলো শুনে গেল, তারপর আপনা হতেই তার চোখ আমার ওপরেই এসে পড়ল।

মুখটা যথাসম্ভব করুণ করে বললাম, আমি সত্যি হুঃখিত প্যাপেন, মনে হচ্ছে আমায় সরিয়ে দিলেও এ তল্লাটে তোমরা বেশীদিন টিঁকতে পারবে না।

প্যাপেনের মুখ তখন বেশ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। গম্ভীর মুখে বললে, হ্যাঁ জংলীদের ঢাক ত তাই বলছে। কালকের মধ্যেই ওদের পক্ষে আমাদের আক্রমণ করা অসম্ভব নয়।

এত বড় বিপদের মুখে আমার কথাটা প্যাপেন ও তার সঙ্গীদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবার জন্যে তারা বেরিয়ে যাবার পর প্রাণভরে নিজের মনে এক চোট হেসে নিলাম। নোয়ালাকে দিয়ে

সময় মত দূর থেকে ঢাক বাজাবার ফন্দিটা এতখানি সফল হবে কিনা সে বিষয়ে মনে একটু সন্দেহ সত্যিই ছিল।

নিজের ফন্দিতে নিজের কি সর্বনাশ ডেকে আনছি তখনও কি জানি? বুঝতে পারলাম হঠাৎ শেষ রাত্রে ঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে। প্যাপেনরা কি করেছিল জানি না, আমি কিন্তু তাদের ভড়কি দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ক্যাম্প খাটে শুয়ে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে টের পেলাম জনকয়েক কালো মুস্কো জোয়ান মুখে কাপড় গুঁজে আমারই খাটের



সঙ্গে শক্ত করে আমায় বাঁধছে। তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে বুঝতে তখন আমার বাকি নেই যে আমার দুষ্টুবুদ্ধি আমারই কাল হয়েছে। প্যাপেনকে ভয় দেখিয়ে এ অঞ্চল থেকে তাড়াবার জন্যে নোয়ালাকে দিয়ে যে মিথ্যে ঢাকের বাদ্যি বাজিয়েছিলাম, প্যাপেনের কুলিরাও তা সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। কাফ্রি কুলিরা এ ঢাকের ভাষা বোঝে। জংলীরা যখন পরের দিন আমাদের শেষ করে দেবে-ই এবং তখন সঙ্গে থাকলে কুলিদেরও যখন মারা পড়তে হবে, তখন সময় থাকতে প্রাণ বাঁচাবার সঙ্গে উপরি লাভ তারা করে নেবে না কেন, এই হল তাদের কথা। জানাশোনা বিশ্বাসী কুলির দল এরকম অবশ্য সাধারণতঃ করে না, কিন্তু ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখবার জন্যে

প্যাপেন সম্ভবতঃ নতুন অজানা লোক ভাড়া করে এনেছিল। তাইতেই এই সর্বনাশ!

কুলিরা যেভাবে বেঁধে গেছল তাতে পরের দিন নোয়ালা এসে না খুলে দিলে ওই অবস্থাতেই হয় অনাহারে শুকিয়ে, নয় জংলীদের হাতে মরতে হত। কিন্তু নোয়ালা যে খবর নিয়ে এল তা আরো ভয়ংকর। অবশ্য এই দুঃসংবাদ দেবার দরকার না থাকলে নোয়ালা আমার খোঁজে আসত না এবং আমারও মুক্তি হত না। নোয়ালার খবর শোনবার পর কিন্তু এ মুক্তি পাওয়া না পাওয়া সমান কথা মনে হল। নোয়ালার মিথ্যে ঢাকের আওয়াজে শুধু কুলিরাই ভুল বোঝেনি, দূর-দূরান্তরের জংলী জাতেরাও তাতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দিনের বেলা এ অঞ্চলের শুকনো লম্বা ঘাসের জঙ্গলের ওপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম থেকে সারাক্ষণ প্রচণ্ড এক হাওয়া বয়। সে হাওয়ার শব্দের জন্যে আর নিজের দুঃখের চিন্তায় এতক্ষণ যা খেয়াল করিনি এইবার কান পেতে তা শুনতে পেলাম। দক্ষিণের সমস্ত আকাশ ঢাকের আওয়াজে গমগম করছে।

কি এখন করা যায়! যতদূর বোঝা যাচ্ছে জংলীরা দল বেঁধে অনেক আগেই রওনা হয়েছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হিংস্রবন্যার মত তারা এই অধিত্যকায় এসে পোঁছোবে। এখন পালাবার কথা ভাবা বাতুলতা, অথচ কুলিরা যেভাবে সব লুট করে নিয়ে গেছে তাতে বন্দুক দূরের কথা যুঝে মরবার মত একটা লোহার ডাণ্ডাও নেই।

এইবার প্যাপেনদের কি অবস্থা হয়েছে দেখতে গিয়ে আরো অবাক্ হলাম। কুলিরা তাদেরও সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে সত্যি কিন্তু বাঁধা পড়ে আছে শুধু একা প্যাপেন। বাঁধন খোলবার পর প্যাপেনের কাছে সব খবর পেলাম। তার সঙ্গী দুজন একেবারে আকাট গোঁয়ার নাৎসী। ঢাকের আওয়াজের মর্ম নিয়ে প্যাপেনের সঙ্গে তাদের ঝগড়া হয়েছে। প্যাপেন তাদের ফিরে যেতে পরামর্শ দিয়েছিল। তাতে তারা তাকে ভীরু কাপুরুষ

বলে গাল দিয়ে নিজেরাই বন্দুক টর্চ ও গেগার কাউণ্টার নিয়ে সেই রাত্রেই পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে গেছে। জংলীরা আসুক না আসুক ইউরেনিয়ামের খনির খোঁজ তারা করবেই।



ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে জংলীদের ঢাকের বাদ্যি আর চীৎকার ক্রমশ আরো কাছে তখন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু জংলীদের হাতে প্রাণ যাওয়ার চেয়ে এই বিপদটাই তখন বড় মনে হল। বিহে অধিত্যকায় ইউরেনিয়াম যে কি পরিমাণ আছে তা আমি নিজেই গত কয়েকদিনে জানতে পেরে অবাক্

হয়েছি। পিচব্লেণ্ডের সে-সব মোটা মোটা শিরার সন্ধান পাওয়া জার্মান ছোকরা তুজনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নয়। এত কষ্ট এত ফন্দি ফিকিরের পর এই ঐশ্বর্য শেষ পর্যন্ত তাহলে নাৎসীদের হাতেই পড়বে! না তা কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু জংলীদের হাতে খানিক বাদেই যার প্রাণ যেতে বসেছে তার পক্ষে কি এমন করা সম্ভব!

হঠাৎ প্যাপেনকে একটা চুরুট ধরাতে দেখে মাথার মধ্যে আমার যেন বিত্যুৎ খেলে গেল। এখনো হয়ত এক ঢিলে তু পাখী অনায়াসে মারা যায়। নাৎসী ছোকরারা দক্ষিণ দিকের পাহাড়েই গেছে, জংলীরাও সেই দিক থেকে আসছে। জংলীদের হাতে তারা পড়ুক বা না পড়ুক, এক উপায়ে তুই শত্রুকেই এখন হার মানান যেতে পারে।

উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম,—শীগ্‌গির প্যাপেন শীগ্‌গির তোমার দেশলাইটা দাও।

দেশলাই! দেশলাই কি হবে?

রেগে উঠে বললাম,—জংলীদের হাত থেকে বাঁচতে যদি চাও ত শীগ্‌গির দেশলাইটা দাও।

দেশলাই দিয়ে তুমি হাজার হাজার জংলী ঠেকাবে!—প্যাপেন যেভাবে আমার দিকে তাকাল তাতে বুঝলাম আমার মাথা নিশ্চিত বিপদের মুখে খারাপ হয়েছে বলে তার ধারণা।

এবার ধমকে উঠলাম,—দেশলাই তুমি দেবে কিনা?

প্যাপেনের কথায় কিন্তু একেবারে বসে পড়লাম। আমার মারমূর্তি দেখে সভয়ে সে বললে,—দেশলাই কোথায় পাব। মাত্র ওই একটা কাঠিই ছিল। কুলিরা কি কিছু রেখে গেছে!

সত্যিই এবার হতাশ হলাম। সামান্য একটা দেশলাইএর কাঠির অভাবে এত বড় সুযোগটা নষ্ট হয়ে যাবে! হঠাৎ নিজের পকেটে কি একটা হাতে ঠেকল। তুলে দেখি একটা কাঁচের টুকরো। আগের দিন দূরবীন থেকে

খুলে গেছল বলে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। কুলীরা দূরবীনটা নিয়ে গেছে, কাঁচটায় আর হাত দেয়নি।

ঘনাদা একটু থেমে সগর্বে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—এই কাঁচের টুকরোর জোরেই জংলীদের হাত থেকে সে যাত্রা বেঁচে ফিরলাম, নাৎসীরাও অ্যাটম-বোমা তৈরি করবার মত ইউরেনিয়াম পেল না।

শিশির ভুরু কুঁচকে বললে,—তার মানে ?

অনুকম্পার হাসি হেসে ঘনাদা বললেন,—এই সোজা ব্যাপারটা আর বুঝতে পারলে না। আগেই ত বলেছি বিহে অধিত্যকায় সারাদিন উত্তর-পূব থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া বয়, সমস্ত অধিত্যকাটা তার ওপর শুকনো ঘাসের জঙ্গলে ঢাকা। এই কাঁচের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো ফোকাস করে সেই ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিলাম। দেখতে দেখতে কোটি কোটি নাগ-নাগিনীর মত সে আগুন দক্ষিণ দিকে যতদূর চোখ যায় ছড়িয়ে গেল। জংলীরা আমাদের আক্রমণ করবে কি প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে তখন বাঁচে ; আর নাৎসী ছোকরারা সে আগুনে যদি রক্ষাও পেয়ে থাকে তাহলেও ইউরেনিয়াম খোঁজবার ফুরসত আর তাদের মেলেনি।

হঠাৎ শিশিরের হাতটা টেনে নিয়ে হাতঘড়িটা দেখে ঘনাদা বললেন,—তাইত শিবু তোমাদের ক্লাবের অনুষ্ঠানটা ত শেষ হয়ে গেল দেখছি। আজ আর গিয়ে ত লাভ হবে না কিছু।

শিশিরের সিগারেটের টিনটা ভুলে তুলে নিয়ে ঘনাদা উঠে গেলেন। আমরা থ হয়ে বসে রইলাম।

মাছ



ঘনাদা একেবারে ব্যাঘ্রঝম্প দিয়ে থালার উপর দু'বাহু মেলে ধরে হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন। রামভুজ নেহাত আমাদের মেসের অনেক পুরনো ঠাকুর তাই, নইলে আর কেউ হলে বোধ হয় গামলা-টামলা সুদ্ধ উল্টে পড়ে খাবার ঘরে একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে ফেলতো।

রামভুজ ঘনাদাকে চেনে। তাই শুধু এক পা পিছিয়ে গিয়ে, বাঁ-হাতের বাটি-বসানো থালাটা চীনে ভেল্কিবাজের মত অদ্ভুত কায়দায় সামলে নিয়ে বললে,—কি হোইলো বাবু, মাছের ঝোল খাইবেন না! ভালো মাগুর মাছের ঝোল।

মাগুর মাছের ঝোল খাব আমি!—ঘনাদার কথায় মনে হোলো, হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে নিষিদ্ধ খাদ্য যেন তাঁকে জোর ক'রে খাওয়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আসল ব্যাপারটা যে কি তা আমরা অবশ্য সবাই জানি—ঘনাদা নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়ে বেরুবার জন্যে এখন ছটফট করছেন।

ছুটির দিন, আর তার ওপর গৌরের পাসের খবর বার হবার দরুন সকালবেলা সবাই মিলে ব'সে একটা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের ব্যবস্থা

করছিলাম। এমন সময়ে শিশিরের কাছে একটা সিগারেট ধার করতে—এ পর্যন্ত মাত্র ২৩৫৭টা তিনি ধার নিয়েছেন—ঘনাদা ঘরে ঢুকেছেন। যথারীতি সিগারেটটা ধরিয়ে চলে যাবার মুখে আমাদের ভাবগতিক দেখে বোধহয় সন্দিহান হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন—ব্যাপার কি হে! সকালবেলা এত জরুরী মিটিং কিসের?

—এই একটু ফিষ্টের ব্যবস্থা করছি আজ। আপনি—

—ফিষ্ট!—ঘনাদা শিবুকে কথাটা আর শেষ করতে দেননি। 'ফিষ্ট' শুনলেই তাঁর ভয় হয়, পাছে কেউ তাঁর কাছে চাঁদা চেয়ে বসে! তাই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছেন, তোমাদের নিত্যি ওই এক হুজুগ। আমার বাপু পেটটা আজ তেমন ভালো নেই।

যেন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে গৌর বলেছে—আচ্ছা, আপনার জন্যে তাহ'লে আলাদা ব্যবস্থাই করবো।

—হ্যাঁ তাই কোরো! বলে ঘনাদা বেরিয়ে গেছেন।

সেই আলাদা ব্যবস্থার দরুন মাংসের কালিয়ার বদলে তাঁকে সত্যিই মাগুর মাছের ঝোল পরিবেশন করা হবে, ঘনাদা তখন ভাবতেই পারেন নি! আপত্তিটা তাই তাঁর এত তীব্র। সব বুঝেসুঝেও শিবু কিন্তু ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা করলে,—আপনিই না সকালে বললেন, পেটটা তেমন ভালো নেই, তাই তো আপনার জন্যে আলাদা ক'রে—

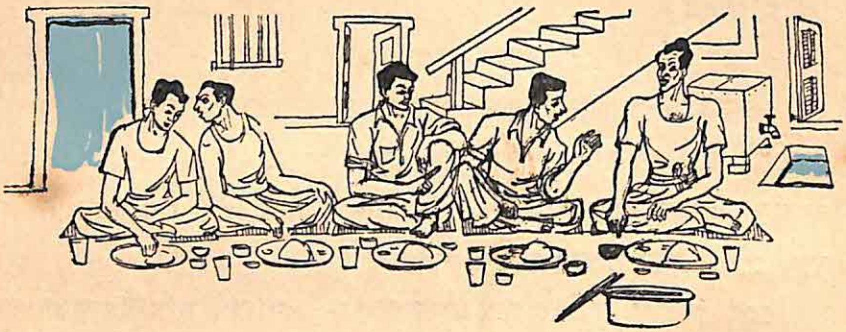
শিবুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ঘনাদা যেন আর্তনিনাদ ক'রে উঠলেন,—তাই বলে—মাগুর মাছ?

গৌর যেন অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে জানালে—কেন, মাগুর মাছ তো রুগীর পথ্যি, হাল্কা বলেই জানি।

জানো যদি তো তোমরাই খাও না! আমার অত উপকার নাই করলে। —খেঁকিয়ে উঠলেন ঘনাদা।

এবার আমাকেই কথা বলতে হলো। বেশ একটু কাঁচুমাচু মুখ ক'রে

বললাম—তা হ'লে তো বড় মুশকিল হলো ঘনাদা, আমাদের জন্যে যে আবার মাংসের কালিয়া রান্না হয়েছে,—তাও আবার চর্বিওয়ালা খাসির মাংস, সে তো আপনার চলবে না !



ঘনাদা যেন অত্যন্ত অনিচ্ছা-সহকারে বললেন,—যেমন ক'রে হোক তাই চালাতে হবে। অন্য যে-কোনো মাছ হলেও হতো, কিন্তু মাগুর মাছ প্রাণ থাকতে তো মুখে তুলতে পারবো না।

—মাগুর মাছে এত আপত্তি কেন বলুন তো ? অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে গৌর। ঘনাদার পাতের ধারে রামভুজ তখন মাংসের কালিয়ার বাটি ধরে দিয়েছে। পর পর সে রকম ছুটি বাটি শেষ না করা পর্যন্ত ঘনাদা মুখ তুলে তাকাবার পর্যন্ত ফুরসত পেলেন না।

মাংসের পর চাটনি এবং তারপর দই ও সন্দেশ পর্যন্ত ঘনাদা যেন এক নিশ্বাসে চোখ কান বুজে চালিয়ে গেলেন। সন্দেশের পর পান্তোয়ায় এসে তাঁর গতি একটু মন্থর হতে দেখে ভরসা পেয়ে বললাম,—পেটটা আপনার সত্যিই আজ খারাপ ছিল দেখছি ঘনাদা।

আমার কথার খোঁচা যদি কিছু থাকে তা ঘনাদাকে স্পর্শই করলো না। Acute angle-এ তিনি খাওয়া শুরু করেছিলেন, এখন Obtuse

angle-এ পৌঁছে তাঁর শরীর মন মেজাজ শরতের আকাশের মত প্রসন্ন হয়ে গেছে।



মধুর ভাবে একটু হেসে বললেন,—সেইজন্যেই বুঝি মাগুর মাছের ব্যবস্থা করেছিলি ? ভালো—ভালো ! তা, তোদের আর দোষ কি বল, মাগুর মাছ যে কেন খাই না তোরা কি ক'রে বুঝবি !

—একটু বুঝিয়েই দিন না ঃ সকাতর অনুনয় করলে গৌর।

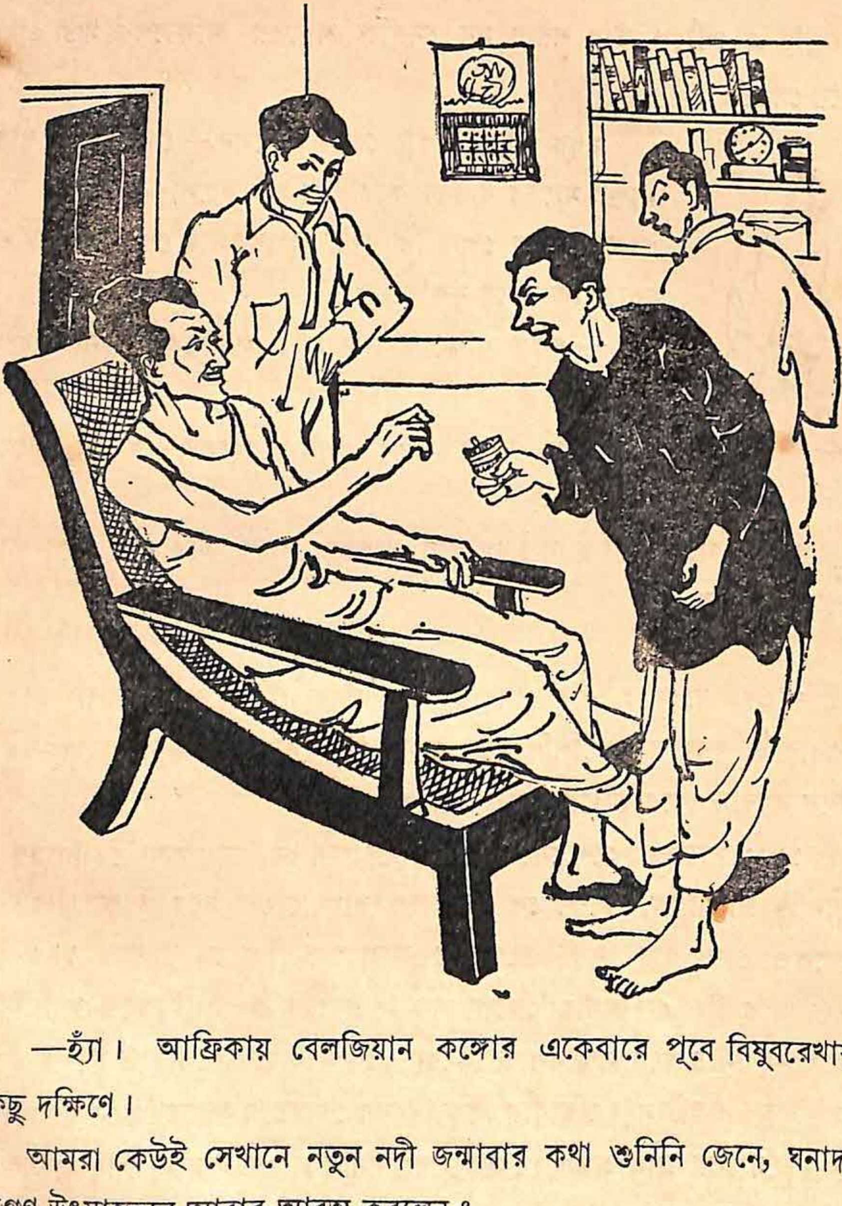
ঘনাদা উদার ভাবে আশ্বাস দিলেন—আচ্ছা দেবো, দেবো, এই—

প্রকাণ্ড পান্তোয়াটায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন তাঁর শেষ কথা আর শোনা গেল না।

খাওয়া দাওয়ার পর বসবার ঘরে তাঁর মৌরসীপাট্টাওয়ালা আরাম কেদারাটি দখল ক'রে শিশিরের একটা সিগারেট—২৩৫৮টা হোলো—ধার নিয়ে আরাম ক'রে ধরিয়ে ঘনাদা শুরু করলেন ঃ

১৯২৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর যে চন্দ্রগ্রহণ হয়, তার কথা তোমাদের না জানাই স্বাভাবিক, কারণ সে চন্দ্রগ্রহণ বাংলাদেশে দূরে থাক, ভারতবর্ষ থেকেও দেখা যায় নি। তবে ডাঃ আলফ্রেড হিল যে কারণে ১৯৩০-এ এফ. আর. জি. এস অর্থাৎ 'ফেলো অফ দি রয়্যাল জিওগ্র্যাফিকাল সোসাইটি' রূপে মনোনীত হয়ে সম্মানলাভ করেন···কিভু এবং এডোয়ার্ড হ্রদের মধ্যে সেই নতুন একটি নদী জন্মাবার কিছু বিবরণ তোমরাও হয়তো শুনে থাকবে।

ভূগোলের জ্ঞান আমাদের সকলেরই সমান। ওরই মধ্যে শিবু যা একটু-আধটু চর্চা করে ! ঘনাদা ওই পর্যন্ত ব'লে চুপ করবার পর সে জিজ্ঞাসা করলে —কিভু আর এডওয়ার্ড হ্রদ কোথায় বলুন তো ? আফ্রিকায় না ?



—হ্যাঁ। আফ্রিকায় বেলজিয়ান কঙ্গোর একেবারে পূবে বিষুবরেখার কিছু দক্ষিণে।

আমরা কেউই সেখানে নতুন নদী জন্মাবার কথা শুনিনি জেনে, ঘনাদা দ্বিগুণ উৎসাহভরে আবার আবস্ত করলেন ঃ

জার্মানীর এক নামজাদা সার্কাস কোম্পানী আর স্পেনের এক

চিড়িয়াখানার বায়না নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে-জঙ্গলে তখন নানা জাতের অদ্ভুত দুষ্প্রাপ্য প্রাণী ধরে বেড়াচ্ছি। চিড়িয়াখানার ফরমাশ মত প্রায় সব-কিছুই তখন ধরা হয়ে গেছে। জিরাফ আর জেব্রার মাঝামাঝি অদ্ভুত প্রাণী ওকাপি, কঙ্গোর লাল বামন মোষ, বাঘা বেড়াল, চিতা হায়না, এ সব তো আমার সঙ্গে আছেই, তাছাড়া নানা জাতের পাখি, মাছ, সাপও যোগাড় করেছি। সার্কাস কোম্পানীর ফরমাশটাই তখন হাসিল করতে বাকি। সেটা বেশ একটু শক্ত। তাদের জন্যে একটা বাচ্চা গরিলা ধরে নিয়ে যেতে হবে। গরিলা ধরা বড় সোজা কথা নয়। তার ওপর এমন দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ও পাহাড়ে তারা লুকিয়ে থাকে যে, তাদের সন্ধান পাওয়াই মুশকিল। কঙ্গো ও ক্যামেরুনস্-এর নিবিড় জঙ্গলে প্রথমে বনমানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বিশাল এই প্রাণীটি আবিষ্কৃত হয়। তারপরে কঙ্গোর পূবে কিভু হ্রদের কাছাকাছি পাহাড়ের প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু জঙ্গলে আর এক আরো বড় জাতের গরিলার সন্ধান পাওয়া যায়। আপাততঃ সেই গরিলার আস্তানার দিকেই যাচ্ছিলাম। আফ্রিকার—বিশেষ করে কঙ্গোর জঙ্গলে চলাফেরা যে কি ব্যাপার, ভুক্তভোগী না হলে কল্পনাই করতে পারবে না। এসব জঙ্গল এমন দুর্ভেদ্য যে প্রতি পদে কুড়ুল-কাস্তে দিয়ে পথ পরিষ্কার না করলে এক পাও এগুনো যায় না। দেড় শ থেকে দু শ ফুট উঁচু বড় বড় গাছ লতায়-পাতায় আকাশ এমন ঢেকে রেখেছে যে দিনের বেলাতেও সেখানে সূর্যের আলো অতিকষ্টে চুইয়ে আসে। সেই ঘন গাছের জটলার তলায় আগাছার জঙ্গলই ১৫ ফুট উঁচু। তারই ভিতর আবার অর্চিলা ও লতানে রবার গাছের দুর্ভেদ্য জট।

যে জায়গাটায় সেদিন বিশ্রাম করবার জন্যে তাঁবু ফেলেছিলাম, সেখানে এই জঙ্গল অনেকটা হাল্কা হয়ে 'সাভানা' অর্থাৎ ঘাসের প্রান্তর শুরু হয়েছে। এই ঘাসও অবশ্য যেমন-তেমন নয়। ছ ফুট উঁচু একটা জোয়ান মানুষ তার ভেতর অনায়াসে ডুবে যায়। একটা প্রকাণ্ড বাওবাব গাছের তলায়

বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে আমাদের আস্তানা পাতা হয়েছিল। আফ্রিকার জঙ্গলে শিকারে বেরুনোকে বলে 'সফরি'। আমাদের সফরিতে লোকজন তো বড় কম নয়! আসবাবপত্র, রসদ ও জন্তু জানোয়ারের খাঁচা বাক্স ইত্যাদি বইবার জন্যেই এক শ জন 'কাফির'-জাতের মুটে আছে, তার ওপর আছে পাঁচজন 'মাসাই'-জাতের শিকারী।

এ অঞ্চলে সিংহের উপদ্রব খুব বেশি ব'লে আস্তানার চারদিকে চারটে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা ক'রে ও পালা ক'রে দুজন শিকারীকে পাহারায় রেখে সবে তখন নিজের তাঁবুতে এসে শোবার বন্দোবস্ত করছি।

আমার তাঁবুতে দু-চারটে দামী পাখির খাঁচা ও মাছ-গিরগিটি ধরনের দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর কাঁচের জারগুলো সাধারণতঃ থাকে। একটা মাছের জার কি ক'রে ভেঙে ফুটো হয়ে সমস্ত জলটা দেখলাম মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। মাছটা কাঁচের জারের তলায় খাবি খাচ্ছে দেখে সেটাকে অন্য একটা জারে তুলে রেখে জল ঢালছি এমন সময়ে 'জুগন' এসে ঘরে ঢুকলো।

জুগন আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী অনুচর ও সমস্ত কাফির-কুলি ও মাসাই-শিকারীদের সর্দার। যেমন দৈত্যের মত তার চেহারা, সাহসও তেমনি অসীম। খাটো একটা বল্লম হাতে মানুষ-খেকো সিংহের সামনে সে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে। চোখে দেখা যায়—এমন কোন প্রাণীকে সে গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু তার সব সাহস শুধু দিনের বেলায়। রাত হয়েছে কি—একটা পাতা নড়লেও ভূত প্রেত জুজুর ভয়ে সে আঁতকে ওঠে। যাদের ধরা-ছোঁয়া দেখা যায় না সেই অশরীরী-জীবেরা সেই সময়েই তার মত শিকারীদের ঘাড় মটকাবার জন্যে ওৎ পেতে থাকে ব'লে তার ধারণা।

জুগনের মুখ-চোখের ভাব দেখেই বুঝলাম, রীতিমত ভয় পেয়েই সে এতরাত্রে আমার তাঁবুতে ঢুকেছে।

আবার কোন জুজু কোথায় দেখেছে ব'লে তাকে ঠাট্টা করতে যাচ্ছি, এমন সময় নিজেই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে গেলাম।



ভাঁটার মত চোখগুলো বড়-বড় ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে সভয়ে জুগন বললে, শুনতে পাচ্ছেন বোয়ানা ?

শুনতে তখন ভালোরকমই পেয়েছি। না, সিংহ কি ক্ষ্যাপা হাতীর ডাক নয়। অন্ধকার রাত্রির কোন সুদূর প্রান্ত থেকে সমস্ত আকাশের বুক কাঁপিয়ে অস্ফুট একটা ভয়ের স্পন্দন যেন উঠছে—গুম্ গুম্ গু-ম্।

একদিকে সে শব্দ শেষ না-হতে আরেক দিকে সে শব্দের অবিকল প্রতিধ্বনি শুরু হয়ে গেল। সে প্রতিধ্বনি তারপরেই অন্য আর-এক দিক-প্রান্ত ধরে নিতে দেরি করলে না। এমনি করে সে শব্দ—অন্ধকার

আকাশের এককোণ থেকে আর-এক কোণে কোন অদৃশ্য বিরাট দৈত্য যেন লোফালুফি করছে মনে হলো।

ভালো ক'রে খানিকক্ষণ শুনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কিছু বুঝলে জুগন ?

জুগন সভয়ে বললে—হ্যাঁ, বোয়ানা। বলছে, দেবতার দুশমন, শয়তানকে চাই! কোন পাহাড়-জঙ্গল তাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তেলের কড়া তৈরী।

বললাম—ঠিকই বুঝেছো, তবে আর-একটু মন দিয়ে শোনো! বুঝবে, শুধু শয়তান নয়—বলছে, সাদা শয়তানকে চাই।

আর একবার কান পেতে জুগন আমার কথায় সায় দিয়ে বললে—সাদা শয়তানই বলছে বটে বোয়ানা। কিন্তু কার কথা বলছে বুঝতে পারছি না। আমাদের নয় তো ?

এবার হেসে বললাম—তোমাদের কথা তো বাদই দিলাম। কাফ্রীদের মধ্যেও আমাকে সাদা শয়তান—কানা না হ'লে কেউ বলবে না। সুতরাং আক্রোশটা যার ওপরই হোক, আমরা নির্ভয়ে থাকতে পারি।

ইতিমধ্যে ওই শব্দের অল্প বিস্তর মানে বুঝে আমার কাফির কুলি ও 'মাসাই' শিকারীদের অনেকে সভয়ে আমার তাঁবুর সামনে এসে জড়ো হয়েছিল। তাদেরও ওই-কথাই বলে রাত্রের মত বিদায় করলাম।

মুখে ওদের অভয় দিলাম বটে, কিন্তু সারারাত দুর্ভাবনায় ভালো ক'রে ঘুমোতে পারলাম না। আফ্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় যাদের আছে, এ-শব্দের অসামান্য ক্ষমতা ও ভয়ংকর মর্ম তারা ভালো করেই জানে। এ-শব্দ আফ্রিকারই অত্যাশ্চর্য নিজস্ব জিনিস। আসলে বিশেষ এক ধরনের বিরাট ঢাকের শব্দ ছাড়া এ-আর কিছু নয়। কিন্তু যে-দেশের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে, দশ মাইল দূরের গাঁয়ের লোকেরা পরস্পরের ধারে-কাছে ঘেঁষে না ও পরস্পরের ভাষা বোঝে না, সেই দেশে এই ঢাকের শব্দের মারফত টেলিগ্রাফের মত

তাড়াতাড়ি শত-শত মাইল দূর-দূরান্তরে খবর পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এ-ঢাকের শব্দের নিজস্ব একটা ভাষা আছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের এবং ভিন্ন ভাষার লোকেরা এই ঢাকের ভাষা অনায়াসে বুঝতে পারে। এ-ঢাকের শব্দ বিলি করবার ব্যবস্থাও অদ্ভুত। এক গাঁ থেকে ঢাকের শব্দ শোনামাত্র অন্য গাঁ তৎক্ষণাৎ সে-খবর ঢাকের আওয়াজে প্রচার ক'রে দেয়। এমনি ক'রে দেখতে দেখতে বহুদূরে সে খবর ছড়িয়ে যায়। কারুর বিরুদ্ধে এ-ঢাক যদি একবার বেজে ওঠে, তা হ'লে যতদূরে পালাক, এ-ঢাকের নাগাল থেকে পরিত্রাণ পাবার আশা নেই।

বহুদিন আফ্রিকার বহু জায়গায় ঘোরার দরুন এ-ঢাকের ভাষা আমি ভালো করেই বুঝি! আপাততঃ ঢাকের খবর যা শুনলাম, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিছু নেই বলেই মনে হোলো। তবু অস্বস্তিটা একবারে গেল না।

পরের দিন সকালে তাঁবু তুলে আমরা সাভানা পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম। এই পাহাড়ের প্রায় হাজার-দশেক ফুট উঁচুতে পৌঁছোলে গরিলার রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে ব'লে আমার বিশ্বাস। পাহাড় যেমন খাড়াই, তেমনি গভীর জঙ্গলে ঢাকা। যত ওপরেই উঠি, ঢাকের শব্দ কিন্তু আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সে-শব্দ আমাদের পিছুতে লেগেই রইলো।

চারদিনের দিন কিভু-হ্রদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম। আশপাশের ঘন কাঁটা-ঝোপে ভর্তি দুর্ভেদ্য জঙ্গলের চেহারা দেখে মনে হলো, গরিলাদের আস্তানা খুব দূরে নেই। সুবিধে মত একটা জায়গা দেখে সন্ধ্যের আগেই তাঁবু ফেলে একলা একটু এদিক-ওদিক জঙ্গলটার অবস্থা বুঝতে বেরুলাম। গরিলা শিকার করা দস্তুরমত কঠিন ব্যাপার, কিন্তু জ্যান্ত গরিলা ধরা তার চেয়েও অনেক শক্ত। বড় ধাড়ী গরিলাকে জ্যান্ত ধরা তো অসম্ভব বললেই হয়। এমনিতে তারা মানুষ দেখলে গা ঢাকা দিয়ে এড়িয়েই যায়, নিজে

থেকে কখনো আক্রমণ করে না। কিন্তু একবার ঘাঁটালে আর রক্ষে নেই। তখন তাদের মত হিংস্র ভয়ংকর প্রাণী পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। একেবারে অব্যর্থভাবে গুলি না মারতে পারলে তাদের রোখা তখন অসম্ভব। শিকারীর নাগাল একবার পেলে, ঢাকের মত নিজের বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে এসে তাকে পাঁকাটির মত মটকে ভেঙে দিতে পারে।

ধাড়ী গরিলা ধরার আশা তাই কেউ করে না। ধরতে হ'লে বাচ্চা-গরিলাই ধরবার চেষ্টা করতে হয়। বাচ্চা গরিলাকে একা-একা পাওয়া কিন্তু শক্ত। ছোট-ছোট পরিবারে ভাগ হয়ে গরিলারা দলবদ্ধ হয়েই দিনের বেলা গাছের ফলমূল খেয়ে বেড়ায়। রাত্রে ধাড়ী গরিলা কোনো গাছের তলায় পাহারায় থাকে, আর বাচ্চা আর মেয়ে গরিলারা গাছের ওপর ডালপালা দিয়ে তৈরী মাচার মত বাসায় ঘুমোয়। কোনো রকমে কোনো বাচ্চা কোথাও একবার ছটকে না পড়লে তাকে ধরা তাই কঠিন।

পরের দিন কি ভাবে কোন্ দিক দিয়ে গরিলা ধরবার ব্যবস্থা করবো তাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবছি, এমন সময় জুগন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে যা বললে তাতে আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম।

সে নাকি আমাদেরই তাঁবু থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে একটা গরিলাকে যেতে দেখেছে। সে গরিলাটা নাকি দেখতে কতকটা সাদা রঙের।

সাদা রঙের গরিলাই তো অসম্ভব আজগুবি ব্যাপার! তবু সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে জুগনের দেখবার কোনোরকম ভুল হয়েছে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু গরিলা একা-একা গুহায় থাকে এ-রকম তো কখনো শুনিনি! না, ব্যাপারটার সন্ধান নিতেই হয়।

জুগনকে সঙ্গে নিয়ে সেই গুহার মুখে যখন পৌঁছলাম তখন চারিদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

গুহাটা খুব বড় নয়। পাহাড়ের গায়ে একটা বড় ফাটলের মত। কিন্তু

ভেতরটা একেবারে জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকার গুহায় গরিলার মত সাংঘাতিক প্রাণীর খোঁজে ঢোকা প্রায় আত্মহত্যা করারই সামিল।

প্রথমে তাই গুহার মুখে বারকয়েক বন্দুকের আওয়াজ করলাম। ভয় পেয়ে যদি গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ে। তাতে কোনো ফল না পাওয়ায় একটা শুকনো কাঠ মশালের মত জ্বেলে নিয়ে বাধ্য হয়েই ভেতরে ঢুকলাম।

ফাটলটা খানিকটা সোজা গিয়ে, ডানদিকে বেঁকে গেছে। সামনে আমি বন্দুক হাতে সন্তর্পণে এগুচ্ছি। পেছনে জুগন মশাল হাতে আসছে। গরিলাটা যদি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে আসে, গুলি অন্ততঃ একটা চালাবো। তারপর যা হয় হোক।

বাঁকটা ঘুরেই কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

এই কি জুগনের গরিলা ?

পেছনে পাথরের দেয়ালে আটার মত লেপ্টে সভয়ে আমাদের দিকে চেয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে, তার রঙ সাদা এবং চেহারা বিরাট হলেও গরিলা সে নয়।

আমাদের থামতে দেখে হাতের পিস্তলটা উঁচিয়ে সে বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বললে,—খবরদার! এক পা এগিয়েছো কি গুলি করবো।

ততক্ষণে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। হেসে বললাম,—তাতে কি কেউ জখম হবে মনে করছেন, ডাঃ হিল! আপনার তাগ যে কত তা তো আমার জানা!

অবাক্ হয়ে পিস্তল নামিয়ে ডাঃ হিল এবার এগিয়ে এসে বললেন, এ কি, দাস ? তুমি এখানে ?

গম্ভীর হবার ভান করে বললাম, নিয়তির টানে বোধ হয়। নইলে কোথায় দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিলের জঙ্গল, আর কোথায় আফ্রিকার কঙ্গোর সীমান্ত। পাঁচ বৎসর বাদে আচমকা এমন আশ্চর্যভাবে দেখা হবে কেন ?

ডাঃ হিল কৃতজ্ঞভাবে বললেন,—হ্যাঁ, সেবারে তুমি হঠাৎ উদয় না হলে প্রাণটা সেখানে রেখে আসতে হ'ত বটে।



হেসে বললাম, আপনার বন্দুকের টিপ কি রকম সেইখানেই তো টের পাই। কুমীর মারতে গিয়ে প্রায় আমাকেই মেরে বসেছিলেন।

তা প্রায় বসেছিলাম বটে,—ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাঃ হিল বললেন, তবে এবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়েও কোনো লাভ হলো না দাস। এবার আমায় বাঁচানো তোমার ক্ষমতার বাইরে!

আচ্ছা, আসুন তো আমার সঙ্গে, তারপর দেখা যাবে,—ব'লে ডাঃ হিলের হাত ধরতেই তিনি বাধা দিয়ে বললেন,—আমায় সঙ্গে নেওয়া মানে, তোমার নিজের সমূহ বিপদ ডেকে আনা, তা তো বুঝতে পারছো ?

গুহার ভেতরেও জংলীদের সুদূর ঢাকের আওয়াজ তখন শোনা যাচ্ছে। এক-মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে হেসে বললাম,—গায়ে পড়ে বিপদ্ ডেকে আনাই যে আমার বাতিক তা কি এতদিনে বোঝেন নি, ডাঃ হিল।

ডাঃ হিলকে নিজের তাঁবুতে এনে তারপর তাঁর কাছে সমস্ত কাহিনীই শুনলাম।

ডাঃ হিলকে ভূগোল-বিলাসী বললে বোধ হয় ঠিক ভাবে বোঝানো যায়। জীবনে তিনি বন্দুকটা পর্যন্ত ভালো করে চালাতে শেখেন নি, কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক দুর্গমতম জায়গা আবিষ্কার করা তাঁর একটা নেশা। আমাজন নদীর উৎসের কাছে পাঁচ বৎসর আগে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। তাঁর ধারণা, সেবারে আমিই নাকি আমাজন নদীর বিদ্‌ঘুটে এক 'অ্যালিগেটর' কুমীরের কবল থেকে তাঁকে বাঁচাই।

ডাঃ হিলের সমস্ত কথা শুনে এবারে তাঁকে বাচানো এবং সেই সঙ্গে নিজেদের বাঁচবার ব্যবস্থা করা কিন্তু সত্যিই কঠিন ব'লে মনে হলো।

এ-ক'দিন জংলীদের যে ঢাকের খবর শুনেছি তার লক্ষ্য যে ডাঃ হিল স্বয়ং, এ-কথা বোধ হয় আর ব'লে দিতে হবে না।

কঙ্গোর এই অঞ্চলে ভৌগোলিক-অভিযানে এসে শুধু নিজের ভালো-মানুষীর দরুন তিনি এখানকার ভয়ংকর জংলীদের বিষ-দৃষ্টিতে পড়েছেন।

এ অঞ্চলের জংলীরা এখনো সেই আদিমতম যুগে প'ড়ে আছে। তাদের জঙ্গলের বাইরে কোনো দুনিয়া আছে ব'লে তারা জানে না। ঘুরতে-ঘুরতে তাদের এক গাঁয়ে ডাঃ হিল গিয়ে পড়েন। ডাঃ হিলকে তারা প্রথম অদ্ভুত এক জাতের মানুষ ভেবে একটু সমীহই করেছিল। তাঁকে ও তাঁর লোকজনকে আশ্রয় দিয়েছিল সসম্মানে। ডাঃ হিল সেখানে পরোপকার করতে গিয়েই নিজের সর্বনাশ করলেন।

সে-গাঁয়ের সর্দার বহুদিন ধ'রে মাথা ধরার রোগে ভুগছিল। গাঁয়ের ওঝা-পুরুতেরা নানারকম ঝাড়ফুঁক ক'রে ভূত প্রেত মানত করেও তাকে

ভালো করতে পারেনি। ডাঃ হিল দেখে-শুনে একটি অ্যাসপিরিন বড়ি দিয়ে একদম তাকে চাঙ্গা ক'রে তোলেন। আর যাবে কোথায়? সর্দারের কাছে তাঁর খাতির যেমন দশগুণ বেড়ে গেল, গাঁয়ের ওঝা-পুরুতেরাও তেমনি তাঁর ওপর খাপ্পা হয়ে উঠলো হাজার গুণ। জংলীদের মধ্যে তাদের মান-ইজ্জত বজায় রাখবার জন্যে ওঝা-পুরুতেরা না করতে পারে হেন শয়তানি নেই। ভাগ্যচক্রে তাদের একটা সুবিধেও হয়ে গেল। কি একটা ছোঁয়াচে রোগে গাঁয়ের কয়েকটা গরু-বাছুর তখন মারা গেছে। ওঝারা রটিয়ে দিলে যে, ডাঃ হিলই তাঁর যাদুতে এইসব গরু-বাছুর মারছেন। প্রথমে গরু-বাছুর, তারপর মানুষ মারাই তাঁর মতলব। সর্দারকে পর্যন্ত তারা তাই বোঝালে।

বেগতিক দেখে দলবলসুদ্ধ লুকিয়ে পালাতে গিয়েই ডাঃ হিল আরো বিপদ ডেকে আনলেন। তিনি কোনো রকমে তাদের চোখ এড়িয়ে এই পাহাড়ে এসে পৌঁছলেন বটে কিন্তু তাঁর লোকজন সব কচুকাটা হয়ে গেল। এখানে পালিয়ে এলেও অবশ্য তাঁর রক্ষা আছে ব'লে মনে হয় না। ঢাকের খবরে চারিদিকের জংলীদের যে-ভাবে তারা জাগিয়ে তুলেছে, তাতে শেষ পর্যন্ত তাদের খপ্পর থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সেদিনও সারারাত ঢাকের যা আওয়াজ শুনলাম তাতে মনে হলো—ধীরে-ধীরে চারিদিক ঘেরাও ক'রে তারা এই পাহাড়ের দিকেই ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এখন তাদের বেড়াজাল থেকে পালাবার একমাত্র উপায় এই দুর্গম পাহাড় ডিঙিয়ে পুবদিকে টাঙ্গানাইকায় নামবার চেষ্টা করা।

মাঝ-রাত্রের পর ঢাকের আওয়াজ কিছুক্ষণের জন্যে থামতে দেখে মনে একটু আশাও হলো। হয়তো তারা ভোরের আগে আর অগ্রসর হবে না। লোকজনকে তুলে ডাঃ হিলকে সঙ্গে নিয়ে রাতারাতি তাই রওনা হয়ে পড়লাম।

কিন্তু বেশিদূর আর যেতে হলো না। সকালবেলা কিভু-হ্রদের ধারে গিয়ে সবে পৌঁছেছি, এমন সময় সমস্ত পাহাড়-জঙ্গল যেন একসঙ্গে বজ্রের

হুংকার দিয়ে উঠলো। চমকে দেখি, রঙবেরঙের বিদ্‌ঘুটে উল্কি-আঁকা হাজার-হাজার জংলী, ঢাল আর বল্লম হাতে যেন ভোজবাজিতে মাটি ফুঁড়ে উঠে আমাদের ঘিরে ধরেছে।



তারপর যে দারুণ কাণ্ড শুরু হলো তা আর বর্ণনা করা যায় না। ওঝা-পুরুতের লম্ফ-ঝম্ফই সবচেয়ে বেশি। আমাদের পিছমোড়া ক'রে বেঁধে আমাদেরই মালপত্রের মধ্যে ফেলে রেখে তারা যে তাণ্ডব নৃত্য ও আস্ফালন শুরু করলো তা থেকে বুঝলাম, আমাদের সোজাসুজি পুড়িয়ে মারা হবে, না, ফুটন্ত কড়াই-এ সেদ্ধ করা হবে এটুকু তারা এখনো ঠিক করতে পারছে না। জংলী-কাঠের আগুনে বড় বড় কড়াই তখনই কিন্তু চাপানো হয়ে গেছে।

তুপুরের পর স্বয়ং সর্দার আসরের মাঝে দেখা দিলে। তার চোখের চেহারা ও ঘন ঘন নিজের কপাল টেপা দেখে বুঝলাম, আপাততঃ একটা অ্যাসপিরিন পেলে সে বর্তে যায়। শুধু ওঝা-পুরুতের কাছে ছোট হবার ভয়েই বোধহয় সোজাসুজি এসে চাইতে সাহস করছে না।

জংলী হলেও সর্দার একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়। মাথাধরা সারানোর জন্যে ডাঃ হিলের ওপর তার মনটা একটু নরমই ছিল। এগিয়ে এসে তাই ডাঃ হিলকে সে জিজ্ঞাসা করলে, কড়াই-এ সেদ্ধ হয়ে, না, সোজা আগুনে পুড়ে তিনি মরতে চান—এইটুকু বেছে নেবার সুযোগ দিয়ে সে তাঁকে অনুগ্রহ করতে চায়।

তুনিয়ায় আর সব জায়গার মত এই জংলীদের মধ্যেও ভড়ং আর চালের দামই সবচেয়ে বেশি।

পিছমোড়া অবস্থাতেই যতদূর সম্ভব ভারিক্কি চালে ডাঃ হিলের হয়ে গম্ভীর ভাবে বান্টু-ভাষায় বললাম,—আমাদের সেদ্ধ ক'রে, কি পুড়িয়ে মারার আগে তোমার একটু মাথাধরার যাতু-দাওয়াই পেলে ভালো হয় না কি ?

ওঝা-পুরুতরা তৎক্ষণাৎ হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলো। ও যাতু-দাওয়াই সর্দার যেন কিছুতে না খায়। গোড়ায় ভালো হ'লে কি হবে, ও-দাওয়াই শেষে সর্বনাশা বিষ হয়ে উঠবে।

সর্দার কিন্তু একটু যেন দোমনা হয়েছে বুঝে হেসে বললাম,—এত

যাদের হম্বিতম্বি, সেই তোমার ওঝা-পুরুতরাই তাহ'লে মাথা-ধরার একটা যাদু-দাওয়াই দিক দেখি।



সর্দার আর একটু নরম হয়েছে বুঝেই তৎক্ষণাৎ ডাঃ হিলকে দেখিয়ে বললাম,—কটা ভণ্ড ওঝা-পুরুতদের কথায় কাকে তুমি ক্ষেপিয়ে তুলছো?

জানো ! রঙ আর চেহারা দেখে বুঝতে পারছো না যে, এই জঙ্গল-পাহাড় নয়, উনি সেই আকাশের চাঁদ থেকে দয়া ক'রে এখানে নেমেছেন।

চাঁদ থেকে নেমে এসেছেন ? একবার ডাঃ হিলের দিকে, একবার আকাশের দিকে চাওয়ার ধরন দেখে বুঝলাম, সর্দার বেশ কাবু হয়েছে।

ওঝা-পুরুতরাও তাই বুঝেই মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো,—সব বাজে কথা ! চাঁদ থেকে নেমে এসেছেন তার প্রমাণ কি ?

প্রমাণ ওঁর চেহারা ! দেখতে পাচ্ছো না ওঁর গায়ের রঙ !

না—ও-প্রমাণ চলবে না ! আমরা অন্য প্রমাণ চাই।—ওঝা-পুরুতদের কথায় সর্দারকেও অনিচ্ছাসত্ত্বে সায় দিতে হলো।

যেন ব্যাপারটা নেহাত তুচ্ছ এমনি ভাবে বললাম,—বেশ, চাঁদ থেকেই আজ রাত্রে প্রমাণ পাবে !

আমার নিশ্চিন্তভাব দেখে বেশ একটু হতভম্ব হয়ে জংলীরা নিজেদের মধ্যে গিয়ে জটলা শুরু করার পর ডাঃ হিল হতাশভাবে বললেন,—এটা কি করলে দাস ! যদি-বা শুধু পুড়িয়ে মারতো, এখন যে গায়ের ছাল জ্যান্ত ছাড়িয়ে নেবে ! চাঁদের ধাপ্পাটা কেন মিছে দিতে গেলে।

হেসে বললাম—আপনার কোন ভয় নেই। চাঁদের প্রমাণ আমি সত্যি দেবো দেখবেন !

হতাশভাবে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন,—না, ভয় ভাবনায় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। চাঁদের আবার কি প্রমাণ হতে পারে !

আজ কি তারিখ আপনার মনে নেই, নইলে প্রমাণটা বুঝতে পারতেন !

ডাঃ হিল খানিক বিমূঢ় হয়ে থেকে হঠাৎ প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন,—ওঃ ভুলেই গেছলাম ! আজ তো এখানে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে !

হেসে বললাম,—হ্যাঁ, ওর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে !

কিন্তু ভাগ্য যে তখনো আমাদের ওপর অত বিরূপ তা কি ক'রে জানবো। সন্ধ্যে হতে না হতেই কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে

ফেলতে লাগলো। ওঝা-পুরুতদের আস্ফালন তখন দেখে কে! তারাই নিজেদের ভেল্‌কিতে মেঘ আকাশে তুলছে বলে সর্দারকে তখন বোঝাচ্ছে।

অগ্নিমূর্তি হয়ে সর্দার আমাদের কাছে এসে এবার বললে,—কই, কোথায় তোমাদের চাঁদের প্রমাণ—দেখাও!

ভেতরে ভেতরে নাড়ি তখন প্রায় ছাড়বার উপক্রম, তবু বাইরে বেপরোয়া সাহস দেখিয়ে বললাম,—তোমার ওঝা-পুরুতদের কিছু ক্ষমতা আছে মানছি, কিন্তু চাঁদের মানুষের তেজ যে কত বেশি, আর একটু বাদেই টের পাবে!

আমাদের সামনে একটা আধ-পোড়া মশাল মাটিতে পুঁতে দিয়ে সর্দার বললে—বেশ, এই মশাল যতক্ষণ না নেভে ততক্ষণ তোমাদের সময় দিলাম। তারপর জ্যান্ত তোমাদের কলিজা কেটে বার করবো।

তাই কোরো। বলে বেশ জোরে জোরেই হাসলাম। মনে মনে তখন জপছি,—হে আকাশের দেবতা, দয়া ক'রে একটা ঝড় তুলে মেঘগুলোকে তাড়াও। নইলে আর যে রক্ষা নেই।

আকাশের দেবতার দয়া করার কোনো লক্ষণ কিন্তু দেখা গেল না। মেঘগুলো যেন আরো গাঢ় হয়েই জমতে শুরু করলো।

মশালটা প্রায় তখন শেষ হয়ে এসেছে। সেই দিকেই চেয়ে ইষ্টনাম স্মরণ করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় ছলাৎ ক'রে একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখি, কাঁচের জারের মধ্যে রাখা একটা মাছ কি-রকম যেন ছটফট করছে।

ডাঃ হিল নিজের ভাগ্য তখন বোধ হয় মেনে নিয়েছেন। একটু দুঃখের হাসি হেসে বললেন,—মাছটাও আমাদের পরিণাম বোধহয় বুঝতে পেরেছে।

কয়েক মুহূর্ত মাছটার দিকে চেয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম,—না, ডাঃ হিল, আর ভয় নেই। মাছটা আমাদের পরম বন্ধু, আমাদের উদ্ধারের পথই বাতলাচ্ছে।

তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে ডাকলাম,—কোথায় সর্দার! কোথায় সব ওঝা-পুরুত, চাঁদের মানুষের তেজটা একবার দেখে যাও।

সবাই অবাক্ হয়েই কাছে ছুটে এলো।

উচ্চৈঃস্বরে হেসে বললাম,—সামান্য একটা মেঘ দিয়ে আকাশ ঢেকে তোমার ওঝা-পুরুতেরা বাহাছুরী নিচ্ছিলো সর্দার। চাঁদের মানুষ এবার এই পাহাড়-জঙ্গল ছুলিয়ে দিচ্ছে দেখ।

ওঝারা চেঁচিয়ে উঠলো—সব মিথ্যে কথা! সব ধাপ্পা।

জংলীরা ক্ষেপে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি! এমন সময় মাটির তলা থেকে অদ্ভুত একটা প্রচণ্ড গোঙানির শব্দ যেন শোনা গেল। পরমুহূর্তে সমস্ত পাহাড়টা ঢেউ-এর মাথায় নৌকার মত ছুলে উঠলো আর সেই কিভু-হ্রদের জল লাফ দিয়ে উঠে তীর ছাপিয়ে উপচে পড়লো বিশাল স্রোত হয়ে।

সেই প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ভয়ে দিশাহারা হয়ে জংলীরা কে যে কোথায় পালালো ঠিক নেই। ভূমিকম্প যখন থামলো তখন দেখি, আমরাই শুধু আমাদের মালপত্রের মধ্যে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছি, আর কিভু হ্রদের এক পাড় ভেঙে ছুরন্ত এক নদীর স্রোত নিচে বয়ে যাচ্ছে।

ঘনাদা গল্প শেষ করে থামবার পর শিবু জিজ্ঞাসা করলে,—ওই মাছের ছটফটানি দেখেই ভূমিকম্পের কথা টের পেলেন নাকি? কি মাছ সেটা?

ওদেশের একরকম মাগুর মাছ। গম্ভীরভাবে বললেন ঘনাদা,—ইংরাজিতে বলে Cat fish. জাপানে থাকতে ও-মাছের ক্ষমতার কথা জেনেছিলাম। জাপানে তো ভূমিকম্প নিত্যি লেগেই আছে। সেখানকার বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন, ভূমিকম্পের ঠিক আগে মাগুর-জাতের মাছ কি ক'রে যেন তা টের পেয়ে অদ্ভুতভাবে ছটফট করে। অনেকে সেখানে তাই ভূমিকম্প আগে থাকতে ধরবার জন্যে মাগুর মাছ পোষে।

একটু থেমে একটা যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘনাদা বললেন,—যার জন্যে সেবার প্রাণ ফিরে পেলাম, সে মাছ আর কি ক'রে খাই বলো।

—



টুপি

'চু মু লান্ মি।'

'উঁহুঃ! চো মো লঙ্ মা!'

'নাহে না! আসলে ওটা জা মো লাং মা।'

'তার চেয়ে বল না,—কাং তন তিং, কিম্বা শেরিং চেড়ংগা পোতাং ও বলতে পার।'

বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসের বাসিন্দারা হঠাৎ ক্ষেপে গেছে বলে এ থেকে যদি কারুর ধারণা হয়, তাহলে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। এ সব অনুস্বার, বিসর্গ মেশানো কিচির-মিচিরের আসল লক্ষ্য হ'লেন ঘনাদা।

ঘনাদা আজ দুদিন হ'ল আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। তার যথেষ্ট কারণও অবশ্য বর্তমান।

দু'দিন আগে ঘনাদা যথারীতি মেসের বসবার ঘরের সবচেয়ে লোভনীয় আরাম-কেদারাটি দখল করে বসে খবরের কাগজে চক্ষু নিবদ্ধ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শিশিরের দিকে ডান হাতটি নিঃশব্দে বাড়িয়ে

দিয়েছিলেন। তর্জনি ও মধ্যমা অঙ্গুলিটি তাতে এমন করে ফাঁক করে ধরা যে, তা থেকেই তাঁর ইঙ্গিতটুকু পরিস্ফুট।

শিশির সে ইঙ্গিত অমান্য করেনি। অবিলম্বে একটি সিগারেট সেই আঙুলের মধ্যে ভরে দিয়ে সেটি জ্বালবার পরিশ্রমটুকু থেকেও ঘনাদাকে বাঁচাবার জন্যে দেশলাই-এর কাঠি বাগিয়ে ধরেছিল।

অপরাধের মধ্যে সে শুধু সেইসঙ্গে মুখ টিপে আমাদের দিকে একটু হেসে বলেছিল, 'তিন হাজার দু'শ তেইশটা হ'ল ঘনাদা!'

ঘনাদা শিশিরের হাসিটুকু দেখতে পাননি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন বিছুটি গায়ে লেগেছে এমনিভাবে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে উঠে বসেছিলেন।

'কি রকম!'

প্রথমটা আমরা সবাই একটু হকচকিয়ে গেছলাম। ঘনাদার হঠাৎ হ'ল কি?

গৌরই সকলের আগে ব্যাপারটা বুঝে হাসি চেপে বলেছিল, 'গোণায় কিছু ভুল হয়েছে বুঝি!'

'ভুল হয়েছে, মানে?'—ঠকিয়ে যেন আমরা তাঁর সর্বনাশ করে ফেলছি, ঘনাদা এইভাবে বলেছিলেন, 'একেবারে চার-চারটে বাড়িয়ে বলা।'

অন্যদিন হলে শিশির তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে হ্যাঙ্গাম চুকিয়ে দিত। কিন্তু সেদিন সেও কেমন বেয়াড়া জেদ ধরে বসেছিল, 'না ঘনাদা, ও তিন হাজার দু' শ তেইশ-ই হবে।'

'না, তিন হাজার দু'শ উনিশ!'—ঘনাদা প্রবল প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলেন।

শিশির তবু নাছোড়বান্দা। মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না, আপনি যাই বলুন, ও দু'শ তেইশ; আমার গুণতে ভুল হয় না।'

'গুণতে ভুল তাহলে আমারই হয়েছে বলতে চাও।' ঘনাদা গরম হয়ে উঠেছিলেন, বেশ গুণতেই যখন জানি না, তখন তোমার সিগারেট আমার না খাওয়াই ভালো।'

ঘনাদা হঠাৎ আরাম-কেদারা থেকে উঠে ঘর থেকেই বেরিয়ে গেছলেন। অবশ্য সিগারেটটি হাতে নিয়েই।

সেই থেকে তিনি যে আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন, তাঁর অভিমান তারপর আর ভাঙানই যায়নি।

এদিকে আমাদের দিন কাটান দায় হয়ে উঠেছে। এবারের বর্ষা একটু বিলম্বে দেখা দিয়ে শেষের দিকে একেবারে সুদসুদ্ধ পুষিয়ে নিচ্ছে। ফুটবলের রথী-মহারথীরা সব হেলসিঙ্কিতে কি রাজ্য জয় করতে গেছেন, তাঁরাই জানেন। ওদিকে খেলার মাঠে যেতে মন চায় না, এদিকে আমাদের বর্ষার সন্ধ্যাগুলো মাঠেই মারা যাচ্ছে।

ঘনাদাকে অনেকরকম ঘুষ দিয়ে দলে ভেড়াবার চেষ্টা এ ছ'দিন করা হয়েছে. প্রথম দিন পাড়ার বিখ্যাত তেলেভাজার দোকান থেকে ফুলুরি বেগুনি ভাজিয়ে এনে ওপরের বসবার ঘরে একেবারে থালাসুদ্ধ সাজিয়ে নিয়ে বসেছিলাম, ঘনাদা যদি গন্ধে এসে বসেন।

ঘনাদা তাঁর ওপরের ঘর থেকে নেমে এলেন ঠিকই, কিন্তু তারপর মাত্র ছ' সেকেণ্ড আমাদের আড্ডা-ঘরের দরজায় দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে আবার নিচে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিন ঘনাদার জন্যে আস্ত একটা সিগারেটের টিন শিশির টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছে। সেই সঙ্গে মোড়ের রেস্তোরাঁ থেকে চিংড়িমাছের কাটলেট।

এদিন চৌকাঠ থেকে চলে না গিয়ে ঘনাদা ঘরের ভেতর এসে বসেছেন, কিন্তু আমরা যে ঘরে আছি, তা যেন তিনি দেখতেই পাননি।

শিশির অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের টিনটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরতেই কিন্তু সব মাটি হয়ে গেছে। সিগারেটের বদলে শিশিরকেই যেন জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টিতে ভস্ম করে ঘনাদা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

আজ তিনদিনের দিন আমরা একেবারে তাই নতুন প্যাঁচ ধরেছি।

আজ টেবিলের ওপর ফুলুরি, বেগুনি বা কাটলেট নয়, গরম হিঙের কচুরি একথালা সাজান আছে, সেই সঙ্গে সিগারেটের টিনও বটে। কিন্তু ওগুলো আসল টোপ নয়, চার মাত্র।

আসল টোপ হ'ল আমাদের এই কিচির-মিচির, এবং সেই টোপেই ঘনাদাকে গাঁথা গেল শেষ পর্যন্ত।

গৌর, শিশির ও আমার চালিয়াতি পর্যন্ত ঘনাদা কোনরকমে সহ্য করেছিলেন, শিবুর 'শেরিং চেড়াংগা পোতাং' শুনে একেবারে চিড়বিড়িয়ে উঠে আর থাকতে পারলেন না।

'চো—মো—হিয়ান মি!'—ঘনাদা ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মত ঘর কাঁপিয়ে যেন চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়লেন।

ঠিকমত টোপ দিয়ে ঘনাদাকে গাঁথতে পেরে আমরা যেমন খুশি তেমনি বেশ একটু হতভম্বও হলাম।

ঘনাদার মান ভাঙানর সঙ্গে সত্যি কথা বলতে গেলে তাঁকে একটু জব্দ করার ইচ্ছেও আমাদের ছিল। যত বড় সবজান্তা হবার ভানই করুন, আমাদের ও কিচির-মিচিরের মর্ম বোঝা ঘনাদার পক্ষেও সম্ভব নয় বলে আমরা মনে করেছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি গত দু'দিন ধরে শিবু আর গৌর একরাশি পুঁথি পত্র বই কাগজ ঘেঁটে ওই সব উদ্ভট আজগুবি আওয়াজ জড় করেছে।

এতকরেও ঘনাদার ওপর টেক্কা দেওয়া কিন্তু গেল না।

'চো—মো—হিয়ান মি!' বলে, চিঁহি ডাক ছেড়ে ঘনাদা তিনদিন বাদে তাঁর নিজস্ব আরাম-কেদারায় এসে বসে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'চালবাজি ত করছ, মানে জান এসব কথার?'

আমরা যতখানি সম্ভব বেকুবের মত তাঁর দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি ততক্ষণে থালার হিঙের কচুরির দিকে মনোনিবেশ করেছেন।

পুরো থালাটাই প্রায় সাবাড় করে সিগারেটের টিনটার দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি হঠাৎ থেমে ভুরু কুঁচকে শিশিরের দিকে তাকালেন।

'আমারই ভুল হয়েছিল ঘনাদা',—শিশির তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তিন হাজার দু'শ উনিশই হবে।'

'না, তিন হাজার দু'শ কুড়ি।' বলে শিশিরের ভুল শুধরে ঘনাদা সিগারেট ধরালেন। তারপর আগেকার প্রশ্ন আবার তুলে বললেন,—'বল দেখি কথাগুলোর মানে কি?'

এবার চুপ করে থাকলে আর চলে না। গৌর তাই আমতা আমতা করে বললে,—'ও সব হ'ল মাউণ্ট এভারেস্টের নাম।'

'হ্যাঁ, নাম ত বটে, কিন্তু ও সব নামের মানে কি, আর কোন্ নামটা ঠিক?—ঘনাদা অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে চাইলেন। আমাদের মুখে আর কথা নেই দেখে ঘনাদাই আবার করুণার দৃষ্টিতে আমাদের ওপর চোখ বুলিয়ে শুরু করলেন,—

'কথাগুলো যা আওড়াচ্ছিলে, সবই হ'ল মাউণ্ট এভারেস্টের তিব্বতী নাম। চো সো লঙ্মা মানে হ'ল লঙ্মা দেবী। লঙ্মা বলে কোন শব্দের অর্থ কিন্তু হয় না। লঙ্ বলতে অবশ্য দেশ বোঝায়। জা সো লাং মা মানে হ'ল এক-সঙ্গে পক্ষিণী-দেবী আর গো-দেবী। কাং তন্ তিং মানে হ'ল উর্ধ্ব-লোকের নীল তুষার। নামটায় কবিত্ব আছে, কিন্তু এটা বা শেরিং চেড়ংগা পোতাং অর্থাৎ অমর পঞ্চ দেবীর প্রাসাদও আসল নাম নয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ার আসল তিব্বতী নাম হ'ল, চো মো হিয়ান মি অর্থাৎ 'বিশ্বজননীর পূত সলিল।' চীনারা তিব্বতের রাজধানী লাসা অধিকার করার পর এই তিব্বতী নামটিই চালু করেছে। ভুল করে অনেকে এটা অবশ্য চু মু লান্ মি বলে বানান করে।

বলা বাহুল্য, আমরা এতক্ষণ হাঁ করে ঘনাদার দিকে চেয়ে ছিলাম। গৌরই প্রথম যেন সামলে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি তিব্বতী ভাষা জানেন নাকি?'

আইনস্টাইনকে যেন গুণ-ভাগ জানেন কি না জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ঘনাদা এমনি একটু অনুকম্পার হাসি হাসলেন।

শিবু হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ তুলে বললে,—'কিন্তু নাম যাই দিক, মাউণ্ট এভারেস্টে চড়া আর মানুষের সাধ্যে কুলোল না। সুইস্‌রাও ত হার মেনে ফিরে এল।'

'হ্যাঁ!' ঘনাদা অবজ্ঞাভরে বললেন,—'রুন-এর শেকড় ত আর চেনে না।'

'রুন-এর শেকড় মানে?'—আমাদের চোখ কপালে উঠেছে তখন।

'রুন-এর শেকড় চিনলে কি হ'ত?'—অবাক্ হয়ে আমরা আবার জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

'কি আর হ'ত! টুপিটা তাহলে ফিরিয়ে আনতে পারত!'—ঘনাদা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলে ওঠবার উপক্রম করলেন।

রুন-এর শেকড় আর টুপিতে মিলে আমাদের মাথা তখন ঝিমঝিম করছে, তবু একরকম জোর করেই চারজনে তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলাম।

ঘনাদা যেন নেহাত নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছার সঙ্গে শুরু করলেন,—

'ডাঃ তানাকার নাম তোমরা বোধ হয় শোননি। অত বড় পণ্ডিত-পর্যটক সোয়েন হেডিন-এর পর কমই দেখা গেছে। ইউরোপ-আমেরিকার লোক হলে তাঁর নাম অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ত। এসিয়ার লোক বলেই তাঁর নাম অনেকে এখনো জানে না। অনেক কাল আগে সেই বৃটিশ আমলে তিব্বতে যাবার নতুন একটা পথ, যাকে বলে 'গিরিবর্ত্ম', খুঁজে বার করবার জন্যে বেরিয়ে 'থিয়াং বোচি' মঠে সেবার তিনি ক'দিনের জন্যে বিশ্রাম করছিলেন। নেপালের উত্তরে 'নামচে'। সেখান থেকে 'থিয়াং বোচি' আসতে হলে প্রথমে দুধকোশি নদীর ওপরকার খাড়া পাহাড়ের গায়ে দু'হাজার ফুট উঁচু দুর্গম পথ পার হতে হয়। সে পথ কিছুদূর গিয়ে আবার দুধকোশিতে নেমে যায়। সেখানে কাঠের একটা নড়বড়ে পোল পার হলে—সামনের একটি দু'হাজার ফুট উঁচু চূড়ার মাথায় 'থিয়াং বোচি' মঠ দেখা যায়।



ভারতবর্ষের দিকে এর চেয়ে উঁচু বৌদ্ধ মঠ আর নেই। তিব্বতে যাওয়া-আসার পথে এ মঠের বৌদ্ধ মোহান্তদের সঙ্গে তানাকার বেশ আলাপ হয়ে গেছল। এবারে অভ্যর্থনাটা তাই ভালোই হ'ল। মোহান্তদের অনুরোধে দু'দিনের জায়গায় প্রায় পাঁচ দিন কাটিয়েদেবার পর হঠাৎ একদিন সকালবেলা একজন ছোট-মোহান্তকে দেখে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। এ লোকটির সঙ্গে এ ক'দিন তাঁর বিশেষ দেখাশোনাই হয়নি। শুনলেন—তিব্বতের পাঞ্চেন

লামার চিঠি নিয়ে তিনি 'থিয়াং বোচি' মঠের প্রাচীন তিব্বতী ধর্মগ্রন্থগুলির তালিকা করতে এসেছেন। লোকটির যা পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে তাঁর সঙ্গে তানাকার কোনদিন দেখাশোনা হওয়া অসম্ভব। তবু মনের খট্‌কা তাঁর গেল না। কেন জানি না তাঁর মনে হ'ল তাঁর অত্যন্ত চেনা কোন একজনের সঙ্গে এই মোহান্তর অত্যন্ত মিল আছে। সঠিক পরিচয়টা তবু কিছুতেই মনে আনতে পারলেন না।

তানাকার সন্দেহ যে অমূলক নয়, তার পরের দিন সকালেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। খোদ মোহান্ত ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই তাঁর ঘরে এসে হাজির। তাঁদের মঠের নাকি সর্বনাশ হয়ে গেছে। পাঞ্চেন লামার চিঠি নিয়ে যে লোকটি এসেছিল, সে নাকি জাল। গত রাত্রে 'থিয়াং বোচি' মঠের অত্যন্ত মূল্যবান ক'টি পুরনো তিব্বতী পুঁথি নিয়ে সে নাকি সরে পড়েছে।

খোদ মোহান্তর কথা শুনে তানাকা বুঝলেন, তিনি ঠিক না চিনলেও জাল মোহান্ত তাঁকে ঠিক চিনেছিল এবং সেই জন্যেই ধরা পড়বার ভয়ে সে নিজে থেকেই আগে পালিয়েছে।

কিন্তু পালিয়ে সে যাবে কোথায় ? এখান থেকে নেপালের দিকে যাবার একটিমাত্র সংকীর্ণ পথ। সে পথে এখনকার যে-কোন 'শেরপা' জোয়ান একদিনে তাকে ধরে ফেলবে। আর—উত্তরে নুপৎসে ও লোৎসে এই দুই চূড়ার মাঝখানে বিরাট পঁচিশ হাজার ফুট পাহাড়ের দেওয়াল সেখানে যেন মাউণ্ট এভারেস্টের চূড়া আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। সে দিকে যাওয়া মানে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

খোদ মোহান্তকে সেই আশ্বাসই দিয়ে তানাকা বললেন যে, দক্ষিণে নামচে যাবার দিকে দু'জন 'শেরপা' জোয়ান তিনি যেন পাঠিয়ে দেন। উত্তর দিকে তিনি নিজেই যাচ্ছেন নতুন পথের সন্ধানে। সেদিকে যাওয়ার দুর্বুদ্ধি যদি তার হয়ে থাকে, জীবন্ত বা মৃত যে-কোন অবস্থায় তার কাছ থেকে সমস্ত পুঁথি তিনি উদ্ধার করবেনই।

খোদ মোহান্ত তানাকার কথায় কিছু আশ্বস্ত হলেন। ধর্মচক্র ঘুরিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে সেই দিনই দুপুরের আগে চারজন 'শেরপা' কুলি নিয়ে তানাকা বেরিয়ে পড়লেন।

থিয়াং বোচি থেকে উত্তরে যাবার একটিমাত্র পথ দেবদারু, সরল ও ভূর্জ গাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রথমে ইমজাখোলা নদীর ধারে নেমে গিয়েছে। ইমজাখোলা যেখানে ভূর্জ আর জুনিপার গাছের ঝোপের ওপর দিয়ে পাগলা-ঝোরা হয়ে নিচের অতল গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তার একটু আগে দড়ির পোল দিয়ে তানাকা এই দুরন্ত নদী পার হলেন। সেখান থেকে পাং বোচি পর্যন্ত ওঠবার পরই বড় গাছপালা শেষ হয়ে শুধু মোটা পাহাড়ী ঘাসের প্রান্তর শুরু। সে প্রান্তরেও মানুষের সীমানা—ফারিচে গাঁয়ে এসে শেষ। তারপর চিরতুষারের দেশ, লোৎসে ও নুপৎসের মত বিরাট সব গিরিচূড়া মাউণ্ট এভারেস্টকে ঘিরে যেখানে অলঙ্ঘ্য নিষেধের প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মানুষের পদচিহ্ন কালেভদ্রে যদি বা কখনও পড়ে, তাও বেশীদূর পর্যন্ত পৌঁছোয় না।

যে ফারিচে গাঁয়ের কথা আগে বলেছি, তাকে গাঁ ঠিক বলা উচিত নয়। ও অঞ্চলের চমরী গাই যারা চরায়, সেই রাখালদের এটা একটা অস্থায়ী আস্তানা। শরৎকালে চমরী গাই চরিয়ে শীতের আগেই তারা এখান থেকে নেমে যায়। তারপর পাথর-কাঠ দিয়ে তৈরী ক'টা পরিত্যক্ত কুঁড়ে শুধু পড়ে থাকে।

তানাকা ফারিচে গাঁয়ে যখন এসে পৌঁছোলেন, তখন সেখানে জনমানব নেই। শীত এবার একটু তাড়াতাড়ি পড়েছে। রাখালরা তাই তাদের চমরী গরু-বলদ নিয়ে আগেই নেমে গেছে।

ফারিচে গাঁয়ে এসে মনে হ'ল পুঁথিচোর জাল মোহান্তকে ধরা বোধহয় খুব শক্ত হবে না। এখান থেকে উত্তরে ছাড়া আর কোনদিকে তার যাওয়া অসম্ভব। অথচ উত্তরে যাওয়া মারাত্মক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। সেখান থেকে তিব্বতের দিকে যাওয়ার কোন 'পাস্' বা গিরিপথ যদি থাকেও,

তা অত্যন্ত দুর্গম হতে বাধ্য। তা ছাড়া এদেশের সব চেয়ে সাহসী ও ঝানু 'শেরপা' জোয়ানদের পক্ষেও একলা সে-পথ খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।

ফারিচে গ্রাম ছাড়িয়ে পরের দিন তানাকা 'লবুজ্যা খোলায়' গিয়ে পড়লেন। এই উপত্যকা দিয়েই খুম্বু 'গ্লেসিয়ার' বা হিমবাহ নেমে এসেছে। লবুজ্যা খোলা উপত্যকার একটু ওপরে উঠতেই পুমোরি, লোলা, লিঙ্‌ট্রেন প্রভৃতি মাঝারি চূড়ার সঙ্গে মাউণ্ট এভারেস্টের পশ্চিম ঢাল দেখা গেল। ওদিকে হুপৎসে লোৎসে আর এদিকে এই সব চূড়া যেন পারিষদবর্গের মত মহামহিম সম্রাট্ এভারেস্টকে ঘিরে আছে। পারিষদেরাও কেউকেটা নয়। বিশ থেকে আটাশ হাজার ফুট তাদের উচ্চতা।

লবুজ্যা খোলায় এসেও জাল মোহান্তের খোঁজ না পেয়ে তানাকা একটু অবাক্ হলেন। তাঁর সমস্ত অনুমানই কি তাহলে ভুল? সন্ধ্যের দিকে সেদিন দারুণ তুষার-ঝড় উঠল। চারজন শেরপা কুলি একটি তাঁবুতে আর একটিতে তানাকা একলা। সমস্ত রাত প্রায় জেগেই কাটালেন। ঝড়ে তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয় যথেষ্ট, কিন্তু তখন তাঁর মনে আর এক ভাবনা তার চেয়ে বেশী প্রবল।

মাঝ-রাত্রে তুষার-ঝড় থেমে গেল। সামান্য ঘণ্টা দু'য়েক ঘুমিয়ে ভোর হতে না হতেই সাজগোজ করে বন্দুক আর দূরবীন হাতে তানাকা বেরিয়ে পড়লেন।

শেরপা কুলিরা তখনও বোধহয় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাদের তাঁবুর চারিধারে নরম তুষারের ওপর একটা তুষার-চিতার পায়ের দাগ তাঁর চোখে পড়ল। তুষার-চিতাটা অচেনা জিনিস দেখে একটু শোঁকাশুঁকি করে নিচের দিকে নেমে গেছে।

শেরপাদের তাঁবু থেকে আধ মাইলটাক এগিয়ে যাবার পর তিনি তুষারের ওপর আবার এক ধরনের পায়ের দাগ দেখে কিন্তু একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। উপত্যকার একদিকের পাহাড়ের ধার থেকে বেরিয়ে সে পদচিহ্ন তুষার-নদী পেরিয়ে আর একদিকে চলে গেছে।

কোন চতুষ্পদ প্রাণীর পায়ের দাগ তা কিন্তু নয়, মানুষের মতই ছ'পায়ে হাঁটা কোন জীবের। কিন্তু পায়ের অতবড় প্রকাণ্ড মাপ কোন মানুষের হওয়া ত অসম্ভব! তাছাড়া এই আকাশ-ছোঁয়া চিরতুষারের দেশে, খালি পায়ে হাঁটবার মত মানুষ কে থাকতে পারে!

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় তানাকা উত্তেজনার আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। সব কিছু ভুলে সেই পায়ের দাগ অনুসরণ করলেন এবার। তুষার-নদীর ওপর দিয়ে হাঁটা খুব সহজ ও নিরাপদ নয়। কোথাও কোমর পর্যন্ত নরম তুষারে ডুবে যায়, কোথাও বিরাট তুষারের খাদ হাঁ করে আছে, অতি সাবধানে তার ধার দিয়ে পার হতে হয়। পায়ের দাগ অনুসরণ করতে গিয়ে কিন্তু বুঝলেন, যাকে অনুসরণ করছেন, এ তুষার-রাজ্যের কায়দা-কানুন তাঁর চেয়েও তার অনেক বেশী জানা। অনায়াসে দুর্গম বিপজ্জনক সমস্ত জায়গা কখনো লাফ দিয়ে, কখনো পাশ কাটিয়ে সে পার হয়ে গেছে।

কিছুদূর গিয়ে সে-পদচিহ্ন আর কিন্তু অনুসরণ করতে পারা গেল না। তুষার-নদীতে এক জায়গায় প্রায় মাইলখানেক লম্বা ও প্রায় ত্রিশ ফুট চওড়া একটি গভীর খাদ তৈরী হয়েছে। সে-খাদের ওপারের পদচিহ্ন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলেও তাঁর পক্ষে শীতের পোশাক পরে তা লাফ দিয়ে পার হওয়া অসম্ভব। মাইলখানেক ঘুরে আবার তা অনুসরণ করারও তখন সময় নেই।

এমনিতেই আগ্রহে উত্তেজনায় অনেক দূর এসে পড়েছিলেন। তাঁবুতে যখন ফিরে গেলেন, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। পায়ের নিচে ঠাণ্ডা রবফ আর আকাশে জ্বলন্ত সূর্যের এমন তেজ যে, মুখ যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেই অবস্থায় তাঁবুতে এসে তানাকা একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। শেরপা কুলিরা সব গেল কোথায়? এতক্ষণে ত তাদের খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁবু তোলবার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার কথা।

বাইরে থেকে শেরপাদের সর্দার দাওয়া আণ্ডুপকে ডাক দিলেন। কোন সাড়া না পেয়ে এবার তাদের তাঁবুর ভেতরেই গিয়ে ঢুকলেন। চারজনের

মধ্যে একটিমাত্র শেরপা কুলি সেখানে বসে তার জিনিসপত্র বাঁধছে। আর কোন শেরপা কুলির চুলের টিকি দূরে থাক, জিনিসপত্র পর্যন্ত সেখানে নেই।

যে জিনিসপত্র বাঁধছিল, বাইরের আলো থেকে তাঁবুর ভেতরে এসে তানাকা প্রথমটা তাকে চিনতে পারলেন না। তবু অত্যন্ত কড়া গলায় অন্য শেরপারা কোথায় গেছে জিজ্ঞাসা করলেন।

মুখ না তুলেই লোকটা বললে, 'তারা পালিয়েছে!'

'পালিয়েছে! হঠাৎ এরকম পালাবার মানে?'

'জানি না!'

তার উত্তরে নয়, তার কথা বলবার ধরনে হঠাৎ চমকে উঠে সজোরে হু'হাতে তার গলাটা ধরে তানাকা তাকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এলেন।

'আরে ছাড়ো ছাড়ো বন্ধু! গায়ের জোরটা 'ইয়েতি'দের জন্যেই মজুদ রাখো।' শেরপা কুলির মুখে বিশুদ্ধ জাপানী ভাষা শুনে তানাকা একেবারে হতভম্ব।

অবাক্ হয়ে, তার গলা ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'একি! মিঃ দাস।'

গলায় হাত বুলোতে বুলোতে এবার হেসে বললাম, 'যেরকম হাতের জোর দেখিয়েছ, আর একটু হলেই ৺দাস হয়ে যেতাম।'

রসিকতার মত মনের অবস্থা তানাকার তখন নয়। বললেন,—'তুমিই তাহলে জাল মোহান্ত সেজে পুঁথি চুরি করেছ—!'

অম্লান বদনে বললাম, 'তা করেছি, তবে চালুনি হয়ে ছুঁচের ছিদ্র ধরা তোমার কি উচিত? সিনকিয়াং-এর সেই মঠের কথা মনে পড়ে? এ বিদ্যে তোমার কাছেই তখন শিখি।'

সিনকিয়াং-এর এক প্রাচীন গোম্ফা বা বৌদ্ধ মঠের পুরনো পুঁথি সরানোর ব্যাপারে ডাঃ তানাকাকে আমায় সাহায্য করতে হয়েছিল।

সে-কথা এখন গায়ে না মেখে তানাকা রাগের সঙ্গে বললেন, 'কিন্তু আমার কুলিদের তুমি তাড়িয়েছ কেন?'

'এখানকার ঠাণ্ডায় তোমার বুদ্ধিটা একটু জমে গেছে মনে হচ্ছে!' হেসে



বললাম, 'নইলে 'ইয়েতি' নামটা যখনই উচ্চারণ করেছিলাম, তখনই ব্যাপারটা বুঝতে !'

এক মুহূর্তে শেরপাদের পালাবার কারণটা তানাকার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—'ওরাও কি 'ইয়েতি'র পায়ের চিহ্ন তাহলে দেখেছে?'

'হ্যাঁ, বন্ধু হ্যাঁ, ইংরেজী ভাষায় ভুল ব্যাখ্যা করে যার নাম দেওয়া হয়েছে, জঘন্য তুষার-মানব! তোমার ফিরতে দেরি দেখে খুঁজতে গিয়ে সেই 'ইয়েতি'র পদচিহ্নই তাদের চোখে পড়ে। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে তারা হাওয়া।'

তানাকা হতাশ ভাবে এবার বললেন, 'কিন্তু এখন আমার সমস্ত প্ল্যানই যে মাটি হয়ে যাবে।'

'কিছু হবে না বন্ধু, বরং তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুবিধেই হয়ে গেল!'

তানাকা সন্দিগ্ধ ভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তুমি কি জান?'

'জানি বই কি বন্ধু, নইলে শেরপা কুলি সেজে নামচে থেকে তোমার সঙ্গ নিই?'

'তুমি শেরপা কুলি সেজে আমার সঙ্গে এসেছ?'

এবারে তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। যেখান থেকে 'শেরপা' কুলি সে সংগ্রহ করে, সেই নামচে গাঁয়ে কি করে তার আগেই আমি উপস্থিত হয়ে 'শেরপা' মোড়লকে আগে ঘুষ দিয়ে হাত করে রাখি, তারপর 'শেরপা' কুলি সেজে তার সঙ্গে থিয়াং বোচিতে এসে কি করে আবার ভোল বদলে জাল চিঠি দেখিয়ে মোহান্তদের পুঁথিঘরে ঢোকবার সুবিধে করে নিই। তারপর সকলে যখন জাল মোহান্ত কোন্ দিকে গেছে ভেবে আকুল, তখন কেমন করে আবার 'শেরপা' কুলি সেজে তানাকার সঙ্গেই সকলের চোখের ওপর দিয়ে চলে আসি। 'শেরপা' কুলিদের সাহায্য না পেলে অবশ্য এসব সম্ভব হ'ত না। এখান থেকে পালাবার সময় তাই তাদের মোটা বকশিশও দিয়েছি। 'ইয়েতি'দের ভয়ে ততটা নয়, আমার কথাতেই তারা যে তল্পিতল্পা নিয়ে চলে গেছে, এ-কথাটাও তানাকাকে জানিয়ে দিলাম।

এ সব শুনে তানাকা একেবারে খাপ্পা। রেগে উঠে বললে, 'কি সর্বনাশ যে তুমি করেছ তা জান না! আমার উদ্দেশ্য তুমি যদি সত্যি জানতে তাহলে 'শেরপা' কুলিদের অন্ততঃ তাড়াতে না।'

'তোমার উদ্দেশ্য জানি বলেই 'শেরপা'দের তাড়িয়েছি।'

তানাকা এ কথায় আরো রেগে উঠল—'তোমার হেঁয়ালি রসিকতা আমার এখন ভাল লাগছে না।'

'হেঁয়ালি নয় বন্ধু, সহজ কথা! শোন; তুমি যে তিব্বতে যাবার নতুন রাস্তা খুঁজতে এদিকে আসনি সে আমি আগেই বুঝেছিলাম, তোমার আসল উদ্দেশ্য—হিমালয়ের যে চূড়া কেউ জয় করতে পারেনি, তারই আটঘাট জেনে যাওয়া। পরে যাতে দলবল নিয়ে এ চূড়া জয়ের চেষ্টা করতে পার। পাছে সে কথা বললে বৃটিশ সরকার তোমায় নেপালের ভেতর দিয়ে যাবার অনুমতি না দেয়, তাই তুমি ওই মিথ্যে অজুহাত দিয়েছ!'

আমার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে তানাকা বললে, 'আশ্চর্য! আমার এ মনের কথা আমি জাপানেও কাউকে বলিনি! কিন্তু তুমি 'শেরপা' কুলি সেজে আমার সঙ্গ নিয়েছ কেন?'

হেসে বললাম, 'এখনো এ দেশে বৃটিশদেরই রাজত্ব বলে। স্বাধীন দেশের লোক বলে তোমায় যেটুকু অনুমতি দিয়েছে, কালা ভারতবাসী হিসেবে আমায় তাও দিত না। তাই তোমার পাসপোর্ট দিয়েই আমি কাজ চালিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছি। তবে আমার উদ্দেশ্য শুধু এভারেস্টের শুলুক-সন্ধান জানা নয়, বিজ্ঞানের জগতের যা সব চেয়ে বড় হেঁয়ালি, সেই 'ইয়েতি'দের সঠিক পরিচয় নেওয়াও বটে। এখনো পর্যন্ত পায়ের দাগ ছাড়া কোন সভ্য মানুষ তাদের চোখেও দেখেনি।'

তানাকার রাগ এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়েছে, তবু সে হতাশ ভাবে বললে, 'কিন্তু 'শেরপা' কুলিদের তাড়িয়ে আমাদের কি লাভটা হ'ল?'

'লাভ হ'ল এই যে, আমরা কি করছি না করছি তার সাক্ষী কেউ রইল

না। 'শেরপা'রা সঙ্গে থাকলে পরে তোমার আসল উদ্দেশ্য জানাজানি হয়ে যেতই। আর আমার দিক্ দিয়ে 'শেরপা'দের তাড়ান দরকার ছিল এই জন্যে যে, দলবল নিয়ে 'ইয়েতি'দের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। তারা যেমন চালাক তেমনি সতর্ক। দলবল দেখলেই তারা সে-তল্লাট ছেড়ে পালায়। একা একা তাদের খোঁজ পাওয়ার বরং আশা আছে।'

তানাকাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলাম, কিন্তু তারপর এক হপ্তা পর্যন্ত চারিদিকে খোঁজ করেও 'ইয়েতি'দের কোন চিহ্ন না পেয়ে নিজেই ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। আমাদের খাবার রসদ ক্রমশই ফুরিয়ে আসছে। আর ক'দিন এভাবে গেলে ফেরবার উপায়ও থাকবে না।

সেদিন রাত্রে খুম্বু হিমবাহ দিয়ে উঠে আমরা পাহাড়ের ধারের একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছি। গুহা না বলে পাহাড়ের একটা সংকীর্ণ ফাটলই তাকে বলা উচিত। এমনিতে সে ফাটলে রাত কাটালে শীতে জমে যাবার কথা। আমরা কিন্তু এস্কিমোদের মত বরফ দিয়েই শীত নিবারণের ব্যবস্থা করেছি। বরফের চাঁই দিয়ে এমন ভাবে ফাটলের বেরুবার দিকটা ঢেকে দিয়েছি যে, হাওয়া বেরুবার সামান্য একটু ফুটো ছাড়া আর কিছু সেখানে নেই।

যাই করি না কেন সেই রক্ত-জমানো শীতে আরামে ঘুমোন অসম্ভব। সামান্য যেটুকু তন্দ্রা এসেছিল শেষরাত্রে হঠাৎ কিসের শব্দে তা ভেঙে গেল। তানাকাও তখন জেগে উঠেছে। দু'জনে কান পেতে শুনলাম—যেসব বরফের চাঁই দিয়ে আমাদের ফাটল আমরা বন্ধ করেছিলাম, সেগুলো কে যেন সরাবার চেষ্টা করছে। ফাটলের ওপর দিকে হাওয়া যাবার যে ফুটো রেখেছিলাম, তার ভেতর দিয়ে সামান্য ভোরের আলো গুহার ভেতর তখন এসে পড়েছে। ঘুমোবার থ'লে থেকে দু'জনেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরের শব্দটা সেই সময়েই থেমে গেল। মিনিটখানেক কোন শব্দ আর না পেয়ে ফাটলের একটা পাথরের খাঁজে পা দিয়ে উঠে হাওয়ার ফুটোয় চোখ লাগিয়ে যা দেখলাম, অনেক বড় বৈজ্ঞানিক তা দেখবার জন্যে নিজের ডান

হাতটা কেটে দিতে পারত। আমাদের সামনে তুষার-প্রান্তরে তিন-তিনটি 'ইয়েতি' হামাগুড়ি দিয়ে বরফের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ও মাঝে মাঝে যেন পাগলের মত দু'হাতে সেই বরফ খুঁড়ছে।

আর একটি ফুটোয় চোখ লাগিয়ে তানাকাও তখন ব্যাপারটা দেখেছে। দেখে উত্তেজনায় সে আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'ইয়েতি! ইয়েতি! দুনিয়ায় কেউ যা কখন দেখেনি, সেই ইয়েতি!'

রেগে আগুন হয়ে আমি তাকে চুপ করতে বললাম। কিন্তু ক্ষতি যা হবার, তখন হয়ে গেছে। সামান্য যে শব্দ ফুটোর ভেতর দিয়ে বাইরে পৌঁছেচে, 'ইয়েতি'রা তাই শুনেই সবাই একসঙ্গে উধাও। সব চেয়ে ছোট 'ইয়েতি'কে মাঝখানে রেখে তারা যেভাবে ছুটে পালিয়ে গেল, তাকে বাপ, মা ও বাচ্চা নিয়ে তারা একটি পরিবার বলেই মনে হ'ল।

নিজের বোকামির জন্য লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, তানাকা তখনও উত্তেজিত ভাবে বলছে, 'ভালো করে লক্ষ্য করেছ দাস? সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎকে আমরা স্তম্ভিত করে দেব! কে বলে 'ইয়েতি' একরকম বাঁদর বা হনুমান। ওরা দস্তুরমত নতুন এক শ্রেণীর বনমানুষ—গরিলা বা শিম্পাঞ্জির চেয়ে অনেক উঁচু স্তরের। ওদের পরনে চিতার চামড়া আর ঈগলের পালক লক্ষ্য করেছ?'

তাকে থামিয়ে বিরক্ত হয়ে বললাম, 'সবই করেছি। কিন্তু তুমি আহাম্মকের মত না চেঁচালে ওরা এত তাড়াতাড়ি পালাত না,—সে খেয়াল আছে?'

এবার তানাকা সত্যিই অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ল। 'ছি ছি, উত্তেজনায় আমার আর কিছু হুঁশই ছিল না!'

কিন্তু লজ্জা তার বেশীক্ষণের নয়। পরমুহূর্তেই সে আবার জিজ্ঞাসা করলে উত্তেজিত ভাবে, 'আচ্ছা, ওদের বরফ খোঁড়ার ধরনটা ভারি অদ্ভুত, না?'

'হ্যাঁ, ওই বরফ খোঁড়া দেখেই বুঝেছি, প্রাচীন তিব্বতী পুঁথির কথা মিথ্যে নয়।'

'প্রাচীন তিব্বতী পুঁথির কথা!'—তানাকা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল, তারপর সবিস্ময়ে বললে, 'তোমার সেই চুরি-করা তিব্বতী পুঁথি,—তাতে এসব কথা কিছু আছে না কি?'

'আছে বই কি!' ব'লে সঙ্গের ছোট তুষার-গাঁইতি দিয়ে ফাটলের মুখের বরফের চাঁই কেটে সরিয়ে বাইরে এলাম। তারপর ঝুলির ভেতর থেকে আসল পুঁথিটি বার করে তার হাতে দিয়ে বললাম, 'এই জায়গাটা পড়ো দেখি।'



বাইরে তখন বেশ আলো হয়ে গেছে। তানাকা দু'বার জায়গাটা পড়ে বিমূঢ় হয়ে আমার দিকে তাকাল!

হেসে বল্লাম, 'পড়েও হেঁয়ালি মনে হচ্ছে বুঝি? ওতে লিখেছে,—বরফের মধ্যে থেকেও যা আগুনের চেয়ে গরম, সেই রুন-এর শেকড় যারা চেনে, দেবতা না হয়েও দেবতাদের দেশে 'ইয়েতি'দের মত তারা থাকতে পায়। রুন-এর শেকড় যে পায়, চো সো হিয়ান মি অর্থাৎ বিশ্বজননীর পূত সলিল সেই আনতে পারে।'

তানাকা তখনও অবাক্ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম,

'ইয়েতি'রা এই রুনের শেকড়ই খুঁজছিল,—বুঝলে ? 'ইয়েতি'দের দেখা দূরে থাক, তারা এই চির-তুষারের দেশে কি খেয়ে থাকে, তাও বৈজ্ঞানিক পর্যটকেরা এখনো বুঝতে পারেননি। আমরাই বোধহয় প্রথম সে-জিনিস দেখব। চল।'

'ইয়েতি'রা যেখানে ভোরের বেলা বরফ খুঁড়ছিল সেখানেই গিয়ে কিছুক্ষণ সন্ধান করবার পর সত্যি কয়েকটি আশ্চর্য জিনিস পেলাম। নেহাত আগে থাকতে জেনে খোঁজ করছিলাম তাই, নইলে সে জিনিস যে বরফেরই লম্বা টুকরো নয়, কে বলবে! ওপর থেকে দেখে কোন তফাতই বোঝা যায় না। জিনিসটা সাধারণ কোন মূল নয়, ছাতা-জাতীয় কোন উদ্ভিদ বলেই মনে হ'ল, বরফের মধ্যেও যা বেঁচে থাকে।

কৌতূহলী হয়ে সেই রুনের মূল একটু মুখে দিলাম। স্বাদগন্ধহীন কাগজ চিবোচ্ছি বলেই মনে হ'ল। প্রধানতঃ এই জিনিস খেয়ে 'ইয়েতি'রা ওই বিরাট দানবের মত শরীর নিয়ে কি করে বেঁচে থাকে, বুঝতে পারলাম না।

বুঝলাম সেই দিনই সন্ধ্যের দিকে। তানাকাও আমার সঙ্গে রুন-এর মূল কিছু খেয়েছিল। সন্ধ্যের সময় আমাদের সেই ফাটলে ঢুকে সে বললে,— 'হঠাৎ ঠাণ্ডা কিরকম কমে গিয়েছে দেখেছ দাস ?'

আমারও তাই মনে হয়ে একটু অবাক্ লাগছিল। এ-সময়ে হিমালয়ের এ-জায়গায় ঠাণ্ডা তো দিন দিন বাড়বারই কথা, বিশেষ করে সন্ধ্যের সময়ে। সঙ্গে-করে-আনা তাপমান-যন্ত্রটা তাই দেখলাম।

এ কি ব্যাপার! ঠাণ্ডা কমেছে কোথায়! তাপমান-যন্ত্রের পারা ত আরো তু'ডিগ্রি নেমে গিয়েছে!

পরের মুহূর্তেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রাচীন তিব্বতী পুঁথির কথা ত দেখেছি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি!

তানাকাকে সে কথা জানিয়ে বললাম,—'শুধু শেষ কথাগুলো বাজে কবিত্ব বলে মনে হচ্ছে।'



আমাদের অনুমান যে কতখানি ভুল, দু'দিন বাদেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাব কে জানত!

একদল 'ইয়েতি' ভয় পেয়ে পালালেও, রুন-এর শেকড়ের খোঁজে অন্য 'ইয়েতি'রা এখানে পরে আসতে পারে—এই আশায় আমরা দু'দিন ধরে সেই পাহাড়ের ফাটলেই তখন আছি। ফাটলের মুখে তেমনি বরফের চাঁই আটকান। তার দু'টি ফুটোয় চোখ রেখে সারারাত আমরা পালা করে পাহারা দিই।

তিন দিনের দিন ভোরে সত্যিই আমাদের আশা পূর্ণ হ'ল। ভোর হবার আগেই যে 'ইয়েতি'কে সেখানে দেখা গেল, 'ইয়েতি'দের মধ্যেও তাকে দানব বলা চলে। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুটের সামান্য কিছু ওপরে হ'লেও তার লোমশ চওড়া দেহ যেন হিমালয়ের একটা প্রকাণ্ড পাথর। তার পরনেও চিতাবাঘের ছাল, কিন্তু ঈগলের পালক কোথাও নেই।

ফাটলের মুখে বরফের চাঁই এমন ভাবে এবার আমরা সাজিয়েছিলাম যে, এক ধাক্কায় তা সরিয়ে ফেলা যায়।

তানাকাকে নিঃশব্দে নজর রাখতে ইঙ্গিত করে আমি আমার ঝুলি থেকে একটা লম্বা দড়ি বার করলাম।

সাবধান করা সত্ত্বেও তানাকা ফিসফিস করে বললে, 'ও দড়ি কেন, পিস্তল কোথায়!'

'পিস্তল দিয়ে জ্যান্ত প্রাণী ধরা যায় না।'

'তুমি জ্যান্ত 'ইয়েতি' ধরতে চাও!' প্রথমটা অবাক্ হলেও তানাকা তারপর ঠাট্টা করে বললে, 'ইয়েতি' ত আর তোমার ও-দড়িতে আপনি বাঁধা পড়বে না!'

'না, তা পড়বে না, তবে আর্জেনটাইনের 'পাম্পাস'-এ বৃথাই যদি 'গাউচো'দের সঙ্গে না মিশে থাকি, তাহলে এই দড়িতেই তাকে ধরতে ও বাঁধতে পারব।' বলে বরফের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে দেখলাম 'ইয়েতি'-দানব বেশ নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই রুন-এর শেকড় তখনও খুঁজছে।

তানাকাকে পেছনে তৈরী থাকতে বলে এক ধাক্কায় বরফের দরজা ঠেলে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

চক্ষের নিমিষে পিছু ফিরে তাকিয়ে 'ইয়েতি'টা তৎক্ষণাৎ ঝড়ের বেগে দৌড় মেরেছে।

কিন্তু ঝড়ের চেয়ে বেশী বেগ আমার 'লাসো'র। বিদ্যুৎ-গতিতে 'লাসো'র দড়ির ফাঁস গিয়ে 'ইয়েতি'র কোমরে আটকে গেল।

এক সেকেণ্ডের মধ্যে হক্চকিয়ে সে থেমে গেল, প্রাণপণে সেই বাঁধন খোলার চেষ্টাও করল একবার। তারপর বিফল হয়ে সে যা করে বসল, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

হঠাৎ দেখি ঝড়ের বেগে আমি সামনে ছুটে চলেছি। বাঁধন খুলতে না পেরে 'ইয়েতি' আমায় সুদ্ধ সামনেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজের পেছনের ল্যাং-বোটের মত। বিপদ দেখে তানাকাও পেছন থেকে এসে আমার সঙ্গে দড়িটা টেনে ধরবার চেষ্টা করল। কিন্তু 'ইয়েতি'র তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। সে সমানে আমাদের দু'জনকে টেনে উড়িয়ে নিয়ে তখন ছুটছে।

'ইয়েতি'ও থামবে না, আমাদের জেদ আমরাও দড়ি ছাড়ব না। পাছে হাত ফস্‌কে যায় বলে দড়িটা আমরা তখন নিজেদের কোমরে জড়িয়ে নিয়েছি।

কিন্তু 'ইয়েতি' ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ধরা দেবে বলে আমরা যা ভেবেছিলাম, তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। যদি বা সে একবার একটু থামে, আমি দড়ির আর এক ফাঁস বাগিয়ে লাগাবার আগেই আবার দৌড় দেয়। তুষার-প্রান্তরে বিপদের অন্ত নেই। কোথাও বিরাট ফাটল, কোথাও নরম তুষার, যার মধ্যে চোরা-বালির মত ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু যেন মুখস্থ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এমনি অনায়াসে সে সমস্ত বিপদ এড়িয়ে যেতে লাগল।

ঠোকাঠুকি আঁচড় ইত্যাদি একটু লাগলেও অত বেগে যাওয়া সত্ত্বেও তার বাহাদুরিতেই আমাদেরও কোন বিপদে পড়তে হ'ল না।

কিন্তু 'ইয়েতি' চলেছে কোথায়! 'পুমোরি' চূড়া বাঁয়ে রেখে 'লো-লা' চূড়ার দিকে উঠতে উঠতে হঠাৎ 'লো-লা'ও বাঁয়ে ফেলে সে উঠতে লাগল।

এরপর যেখানে এসে সে প্রথম থামল, সেখানে ডান দিকে হুপৎসে ও লোৎসের চূড়া, আর সামনে একটু বাঁ দিক্ ঘেঁষে স্বয়ং মাউণ্ট এভারেস্ট। পাহাড়ের দেয়াল-ঘেরা মাঝখানের জায়গাটা এত উঁচুতে না হলে তুষার-প্রান্তরের বদলে হ্রদ হতে পারত। এখানে একটু থেমেই সে সোজা সেই তুষার-প্রান্তরেই নেমে গেল আমাদের নিয়ে।

তারপর তুষার-প্রান্তর ছেড়ে সে আবার যেই উঁচুতে উঠতে শুরু করল, তখনই আমাদের দুর্দশা চরম হয়ে উঠল। দড়ি দিয়ে নিজেদের ভালো করে বেঁধে নিয়েছিলাম তাই, নইলে কখন শিথিল হাত খুলে গিয়ে একেবারে অতলে আছড়ে পড়তাম। এই অবস্থাতেও তানাকা খানিক বাদে চিৎকার করে উঠল, 'আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে দাস! নিশ্বাস নিতে পারছি না।'

পশমী আলখাল্লার ঝোলা পকেটেই 'অল্টিমিটার' অর্থাৎ উচ্চতা মাপবার যন্ত্রটা ছিল। বার করে দেখি ছাব্বিশ হাজার সাত শ ত্রিশ ফিট! বুঝলাম—এত উঁচু জায়গার পাতলা হাওয়ায় অক্সিজেনের স্বল্পতার দরুনই এমন হচ্ছে! এসব জায়গায় প্রথমটা শরীর বেশ হাল্কা লাগে, তারপর শরীর অবশ হয়ে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

কিন্তু এখন উপায়? হঠাৎ তিব্বতী পুঁথির শ্লোকটার শেষ অংশ মনে পড়ে গেল। দু'জনেরই পকেটে খানিকটা করে রুন-এর শেকড় ছিল।

নিজেরও তখন মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি রুন-এর শেকড়টা বার করে এক কামড় দিয়ে তানাকাকে তৎক্ষণাৎ তাই করতে বললাম।

হাঁফাতে আরম্ভ করলেও 'ইয়েতি' তখনও সমানে উঠছে। যেখান দিয়ে যে ভাবে সে উঠছে, তা মানুষের কল্পনার অতীত। আমরা দু'জন তখন তার কোমরের দড়ি থেকে একরকম ঝুলছি বললেই হয়।

ছাব্বিশ থেকে 'অল্টিমিটারে' সাতাশ হাজার দেখা দিল। তারপর সাড়ে সাতাশ। আটাশের কাছে চোখ প্রায় ঝাপসা হয়ে গেছে, কানে যেন

ভেতর থেকে ঢাক পিটছে। জ্ঞান হারাতে আর বেশী দেরী নেই! রুন-এর শেকড় তাহলে পুরনো পুঁথির গালগল্প ?



হঠাৎ অল্টিমিটারে সাড়ে আটাশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। না, এই ত মাথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে! নিশ্বাসের কোন কষ্ট আর নেই। আশ্চর্য! রুন-এর শেকড়ে তাহলে ডাক্তারী শাস্ত্রের অজানা এমন কিছু আছে, যা ফুসফুসের

অক্সিজেন নেবার ক্ষমতা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়! এ ওষুধ ত চিকিৎসার রাজ্যে যুগান্তর আনবে!

কিন্তু এ কি! এ যে ঊনত্রিশ হাজার ফিট! একেবারে পৃথিবীর ওপরের চূড়োর ওপর দিয়ে 'ইয়েতি'-দানব আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে সেই চূড়োর ওপরও দু'ফুট আন্দাজ একটা ঢিবি দেখে মাথার টুপিটা খুলে তাতে লাগিয়ে দিলাম।

তারপর শুরু হল একেবারে উল্টো দিকে নামা।'

ঘনাদা একটু থামতে শিবু জিজ্ঞাসা করলে,—'ইয়েতিকে শেষ পর্যন্ত ধরলেন তাহলে!'

'নাঃ, ধরতে আর পারলাম কই!' ঘনাদা একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'পাহাড়ে পাহাড়ে ঘষে ঘষে দড়িটা অত জখম হয়ে গেছল বুঝতে পারিনি। তিব্বতের দিকে রং ব্যাক্ গ্লেসিয়ারে নামবার পরই সেটা ছিঁড়ে গিয়ে 'ইয়েতি' পালিয়ে গেল।'

'আচ্ছা, সেই 'রুন-এর' শেকড় ত আপনার পকেটেই ছিল?'—জিজ্ঞাসা করলে গৌর, 'তা একটু এনেছেন নিশ্চয়!'

ঘনাদা এবার যেন একটু বিরক্তই হয়ে উঠলেন, 'কি করে আনব শুনি, রং ব্যাক গ্লেসিয়ার থেকে তিব্বতের লোকালয়ে যাবার পথে তাই খেয়েই ত কাটিয়েছি।'

'আচ্ছা, এভারেস্টের মাথায় যা পরিয়ে দিলেন, সেটা কি টুপি ছিল?'—জিজ্ঞাসা করলে শিশির।

'টপ হ্যাট্ বোধহয়!'—ঘনাদার বদলে গৌরই উত্তর দিলে এবং ঘনাদা আমাদের দিকে ভ্রূকুটি হেনে শিশিরের একটা সিগারেট তুলে নিয়ে উঠে গেলেন।



ছড়ি

ফন্দিটা ভালোই আঁটা হয়েছিল।

ঘনাদাকে জব্দ করার ফন্দি।

রোজ রোজ তিনি আমাদের মাথায় আষাঢ়ে গল্পের চাঁটা মেরে যাবেন, আর আমরা মুখ বুজে তাই সয়ে থাকবো, সেটি আর হচ্ছে না।

এবার তাঁর ওপরেও টেক্কা দেওয়া চাই।

ঘনাদা তখনও এসে পৌঁছোননি।

ইতিমধ্যে চর পাঠিয়ে খবর নেওয়া হয়েছে যে সন্ধ্যেবেলায় লেকের ধারে বেড়ানো সেরে তিনি এইমাত্র মেসের গলির মুখে দেখা দিয়েছেন।

সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বেশ তন্ময় হয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়লাম।

ঘনাদা যখন ঘরে ঢুকলেন তখন আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে সবাই শুনছি আর গৌর বলে যাচ্ছে,—

যেদিকে তাকাই, শুধু সাদা বরফ,—আকাশ সাদা, সব কিছু সাদা, আর ঠিক আমার পেছনে সেই সাদা ভাল্লুক, সাক্ষাৎ যমের মত পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আসছে।

ঘনাদা যে ঘরে ঢুকেছেন আড়চোখে সবাই দেখে নিলেও বাইরে একেবারে কেউ টের পাইনি এমনি ভান করে রইলাম। ঘনাদার মুখখানা সত্যি তখন দেখবার মত। এরকম অবস্থায় আগে কখন বোধহয় পড়েন নি। চিরকাল সভার মধ্যমণি হয়ে জাঁকিয়ে বসাই যাঁর অভ্যাস—তাঁর প্রতি আজ কিনা কারুর ভ্রূক্ষেপও নেই!

গৌর তখন উত্তেজিত ভাবে বলে চলেছে,—রাইফেলের সব গুলি আগেই ফুরিয়ে গেছল, এবার কোন উপায় না দেখে সেটা লাঠির মত করে ধরে ফিরে দাঁড়ালাম······

ভয়ে শিবুর যেন গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছে না, এমনি ভাবে বললে,—তারপর?

কিন্তু গৌর কিছু বলবার আগেই ঘনাদার গলা-খাঁকারি শোনা গেল।

এবার আর তাঁকে অবজ্ঞা করা যায় না। গৌর তাঁর মৌরসীপাট্টা ইজিচেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আরে ঘনাদা যে! কখন এসেছেন টেরই পাইনি!

নির্বিকার মুখে ইজিচেয়ারটায় এসে বসে ঘনাদা বললেন,—তা পাবে কি করে? যে রকম মশগুল হয়ে গল্প করছিলে। তা গল্পটা হচ্ছিল কোথাকার?

আজ্ঞে, দক্ষিণ মেরুর।—পাছে ঘনাদার দিকে চাইলে নিজেকে সামলাতে না পারে সেই ভয়ে গৌর মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে যতদূর সম্ভব সহজ গলায় বলে গেল,—সেবার একটা অভিযানে দক্ষিণ মেরুতে যেতে হয়েছিল কিনা!

হাসি চাপবার জন্যে আমরা মুখ নিচু করে রইলাম।

ঘনাদার কিন্তু কোন প্রকার ভাবান্তর দেখা গেল না। গৌরের পক্ষে দক্ষিণ মেরু যাওয়াটা যেন নিতান্তই বোটানিক্স্ কি চিড়িয়াখানা যাওয়ার সামিল এই ভাবে তিনি বললেন,—তা সাদা ভাল্লুকটাকে করলে কি? বন্দুকের বাড়িতেই সাবাড় করে দিলে নাকি?

গৌরের সেইরকমই কিছু বলবার বাসনা ছিল, কিন্তু ঘনাদার ওপর আর এক কাঠি সরেস হবার এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়! একটু হেসে সে বললে,—আজ্ঞে না, তার দরকার হল না। বন্দুকের ঘা দেবার আগেই দেখি ভাল্লুক ভায়া চিৎপটাং। বরফের মেঝে একেবারে কাচের মত তেলা কিনা ?

ঘরময় এমন কয়েকটা শব্দ শোনা গেল যা অন্য কেউ হলে চাপা হাসি বলেই মনে করত।

কিন্তু ঘনাদার সেদিকে গ্রাহ্য নেই। গম্ভীরভাবে বললেন,—সাদা ভাল্লুকটার ছাল-চামড়া না হোক নিদেনপক্ষে একটা দাঁত কি নখও যদি আনতে পারতে বিজ্ঞানের রাজ্যে হুলুস্থূল পড়ে যেত।

এবার আমাদেরই হতভম্ব হবার পালা।

কেন বলুন তো ?—অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে গৌর,—বৈজ্ঞানিকেরা কি সাদা ভাল্লুক দেখেন নি ?

অন্ততঃ দক্ষিণ মেরুতে কখন দেখিনি। পেঙ্গুইন পাখী ছাড়া সেখানে ডাঙায় চরবার মত কোন প্রাণীই নেই।—ঘনাদা হাই তুলে হু'বার তুড়ি দিলেন।

এমন ভাবে জব্দ হব ভাবিনি। কথাটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দিয়ে শিবু জিজ্ঞেস করলে,—দক্ষিণ মেরুতেও গিয়েছিলেন আপনি ?

হ্যাঁ গেছলাম একবার। যা গরম !

এবার আমাদের চোখ কপালে উঠল। ঘনাদাকে আমরা চিনি, তবু তাঁর মুখে দক্ষিণ মেরুতে গরম শুনে খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

শুধু বললাম,—দক্ষিণ মেরুতে গরম !

হ্যাঁ, গরম বলে গরম! কবে সেখানে গরমে গলে পচে মরতাম। ভাগ্যিস এই ছড়িটা ছিল।—ঘনাদা হাতের ছড়িটা যেন আমাদের দিকেই হু'বার আস্ফালন করলেন।

আমাদের আর কিছু বলতে হ'ল না। ঘনাদা শিশিরের দিকে ফিরে বললেন,—কই হে, একটা সিগারেট ধার দাও না!

ঘনাদার আবার হিসেবে ভুল হবার জো নেই। শিশিরের কাছে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললেন,—এই নিয়ে ২৩৯৮টা হল কিন্তু।

তারপর সিগারেটটায় একটা সুখটান দিয়ে শুরু করলেন,—সেবার সমুদ্রে যেন তিমির গাঁদি লেগেছিল। দক্ষিণ মেরুর দিকে তিমিধরা জেলেদের নজর কয়েক বছর হ'ল তখন পড়েছে। অবাধ বেপরোয়া তিমি শিকারের দরুন উত্তর অঞ্চলের তিমি প্রায় নিঃশেষ হওয়ার ফলেই দক্ষিণ দিকে ইংরেজ, নরউইজিয়ান, জাপানী আর আর্জেণ্টাইন জেলেরা হানা দিতে শুরু করে বটে, কিন্তু দক্ষিণ মেরু অঞ্চলেও এত তিমি এর আগে কখন দেখা যায়নি। নেহাত আনাড়ী জেলে-জাহাজও সেবার তিমির চর্বিতে বোঝাই হয়ে ঘাঁটিতে ফিরেছে! তুখোড় তিমি-শিকারীদের ত কথাই নেই।

আমার জাহাজ যে তিমির চর্বিতে বোঝাই তা বোধহয় বলতে হবে না। নরওয়ের এক জেলে-জাহাজ আধাআধি বখরায় বন্দোবস্ত করে আর সব দল থেকে আলাদা হয়ে ক্যাম্পবেল দ্বীপে তখন আমার ঘাঁটি করেছি। আমার বখরাদারকে আমি সেন বলে ডাকি। তবে সে বাঙালী নয়, নরওয়ের লোক; পুরো নাম ওলাফ সোরেনসেন। আমি তাকে ছোট করে নিয়েছি 'সেন' বলে।

সেন পাকা তিমি-শিকারী। বিশ বছর ধরে উত্তর দক্ষিণের দুই মেরুর হেন জাতের তিমি নেই যে শিকার করেনি। দূর থেকে শুধু তিমির নিশ্বাসের ফোয়ারা দেখে সে নারওয়াল না স্পার্ম, কুঁজো না নীল তিমি, বলে দিতে পারে। আমাদের জাহাজের নাম আমি রেখেছিলাম 'যমুনা'। জাহাজ বললে অবশ্য খানিকটা ভুল বোঝানো হয়। মাত্র চার শ টনের বড় স্টীমার মোট ১৭৫ ফুট লম্বা। তবে তিমি-ধরা জাহাজের মধ্যে একেবারে সেরা আর সবচেয়ে হালফ্যাসানের। এই 'পিল্যাজিক' জাহাজে তিমি ধরে চর্বি

ছাড়াবার জন্যে আর ঘাঁটিতে বয়ে নিয়ে যেতে হয় না। জাহাজের খোলের ভেতরেই সব বন্দোবস্ত আছে।

আমাদের জাহাজে মাঝি-মাল্লা নিয়ে লোক সবসুদ্ধ আমরা ১৮ জন। সেন জাহাজের 'কাকের বাসা' অর্থাৎ মাস্তুলের ওপরকার পাহারা-মাচায় দূরবীন ধরে সমুদ্রে তিমির সন্ধান করে। আর আমি হারপুন-ছোঁড়া কামান চালাই। আমাদের জাহাজে সম্পূর্ণ আধুনিক Svend Foyn হারপুন-কামান বসানো। চার ফুট লম্বা সওয়া মণ ওজনের হারপুন তা থেকে বিদ্যুৎগতিতে তিমির গায়ে গিয়ে বেঁধে। সে হারপুনের মাথায় আবার ছোট বোমা গাঁথা। একবার ঠিক মত তাগ করতে পারলেই তিমির গায়ে বেঁধবার তিন সেকেণ্ডের মধ্যে সে বোমা ফেটে গিয়ে তিমিকে কাবু করে ফেলবেই।

ডিসেম্বর মাসের শেষ। তিমি-ধরার মরশুম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর কিছুদিন বাদেই দক্ষিণ মেরুর শীত চরমে নামতে শুরু করবে। আমাদের জাহাজ তিমির চর্বির ভারে প্রায় ডুবুডুবু। যা চর্বি আমরা পেয়েছি তাতে বছর তিনেক দু'হাতে খরচ করেও রাজার হালে বসে বসে আমরা কাটাতে পারব। সেন রোজ তাই ফেরার জন্যে পেড়াপীড়ি করে। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী নই।

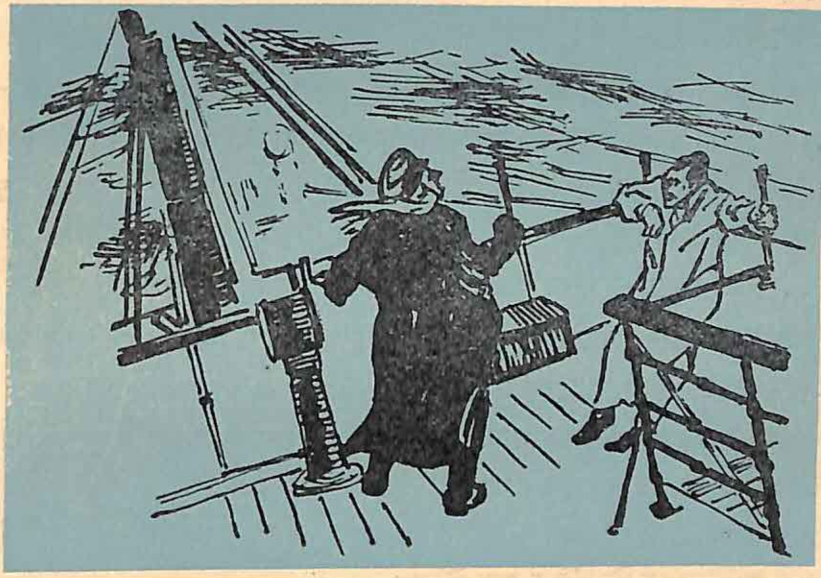
সেদিন সকালবেলা 'কাকের বাসায়' পাহারা দিতে দিতে সেন হঠাৎ নিচে নেমে এল। আমি তখন একজন খালাসীকে দিয়ে হারপুন-কামানটা পরিষ্কার করাচ্ছি। সেনকে দেখে একটু অবাক্ হয়ে বললাম,—নেমে এলে যে বড়! এইটুকুর মধ্যে বড় কোন শিকার যদি ফসকে যায়।

ফসকে গেলে ক্ষতিটা কি?—সেনের মুখ বেশ বিরক্ত—আর শিকার গাঁথলে মাল কোথায় রাখবে বলতে পারো? জাহাজে আর জায়গা আছে?

সেনের বিরক্তি দেখে একটু হেসে বললাম,—আমি যে শিকারের সন্ধান করছি তার মাল রাখবার যথেষ্ট জায়গা এখনো জাহাজে আছে। আর সে মালের কাছে তোমার জাহাজভর্তি চর্বি নেহাত তুচ্ছ।

সেন খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে,—তার মানে এখনো তুমি 'অ্যাম্বারগ্রিস'-এর আশায় আছ ?

আমাদের মুখের ভাব দেখে ঘনাদা গল্প থামিয়ে একটু যেন করুণার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অ্যাম্বারগ্রিস' কাকে বলে, জানো না বুঝি ?



আমরা মাথা নাড়লাম। ঘনাদা ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন,—সাপের মাথার মণির কথা শুনেছ ত ? সে মণি শুধু আজগুবি কল্পনা, কেউ কখনো পায় নি। কিন্তু অ্যাম্বারগ্রিস তিমির মাথার নয়, পেটের সত্যিকার মণি। শুধু একজাতের তিমির নাড়িভুঁড়ির মধ্যে পাওয়া যায়। তাও আবার সে জাতের সব তিমির নয়, দু'চারটির। তিমির পেট থেকে ছাড়া সমুদ্রের জলে আর সমুদ্রের ধারের পলিতেও অনেক সময় হাল্কা নুড়ির মত কালচে ধোঁয়াটে রঙের অ্যাম্বারগ্রিস পাওয়া যায়। এসেন্স আতরের কারবারে সে নুড়ির দাম তার ওজনের সোনার চেয়ে কম নয়।

হ্যাঁ তারপর যা বলছিলাম। সেনের কথা শুনে একটু হেসে বললাম,—অ্যাম্বারগ্রিসের আশায় আছি মানে? তুমি কি মনে করো তোমার ওই নোংরা চর্বির লোভে এই যমের দক্ষিণ দুয়ারে তিমি-শিকারে এসেছি। না হে না, আমার নজর আরো অনেক উঁচুতে। অ্যাম্বারগ্রিস বেশ ভাল রকম আছে, এমন একটা তিমি যদি পাই, তাহলে ও চর্বির বখরা তোমায় এমনিই দিয়ে দেব।

তোমার উদারতার জন্য ধন্যবাদ।—সে একটু বিদ্রূপ করেই বললে,—তবে অ্যাম্বারগ্রিস ত আর যেখানে সেখানে ছড়ানো নেই। স্পার্ম-তিমি ছাড়া ও জিনিস পাওয়া যায় না জানো বোধ হয়, আর স্পার্ম-তিমি এ অঞ্চলে খুব কমই পাওয়া যায়।

হেসে বললাম,—কিন্তু পাওয়া যা যায় তা দস্তুর মত বড় গোছের। এ অঞ্চলে ছুটো-ছাটা ছিটকে যে কটা স্পার্ম-তিমি এসে পড়ে সেগুলো সবই বুড়ো ধাড়ী। 'অ্যাম্বারগ্রিস' তাদের পেটেই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

যেন আমার কথার মান রাখবার জন্যেই আধ মাইলটাক দূরে একটা জলের ফোয়ারা হঠাৎ সমুদ্র থেকে লাফ দিয়ে উঠল।

হাজার হলেও সেন জাত-শিকারী। এক মুহূর্তে ঝগড়াঝাঁটি ভুলে দূরবীন চোখে লাগিয়ে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

তিমি! স্পার্ম-তিমি! সমুদ্রের দেবতা তোমার কথা শুনেছে দাস! আর ভাবনা নেই।

হায়! সমুদ্রের দেবতার মনে কি ছিল তখন যদি জানতাম!

উত্তেজনার ঝোঁকে সেন দূরবীন ছেড়ে তখন হারপুন-কামানে হাত দিয়েছে। আমি বাধা দেবার আগেই প্রচণ্ড শব্দে 'ভেণ্ড-ফয়েন' কামানের হারপুন ছুটে বেরিয়ে গেল।

সেন এমনিতে বেশ ভালো শিকারী। কিন্তু উত্তেজনাতেই তার টিপ তখন বুঝি খানিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। বোমামুখো হারপুন তিমিটার গায়ে

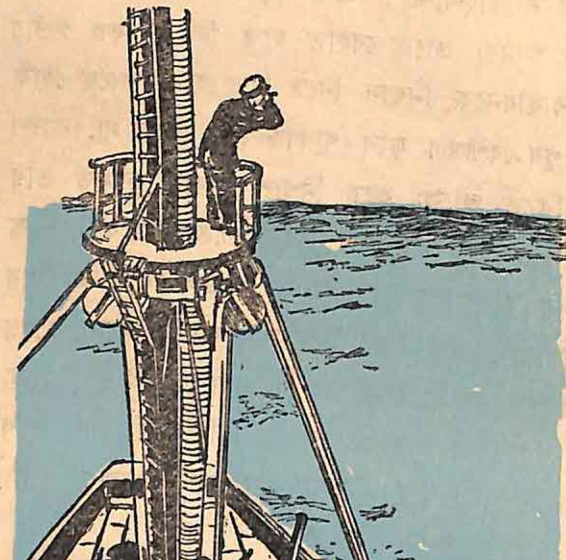
না লেগে কাছাকাছি পড়ে ফেটে গেল। আর তাইতেই হল সর্বনাশ। সঙ্গে সঙ্গে একটি ফোয়ারা ছেড়ে তিমিটা এমন ডুব মারল যে আর পাত্তাই নেই।

কিন্তু আমরাও তখন নাছোড়বান্দা। এত বড় একটা স্পার্ম-তিমির সন্ধান পাওয়ার পর আর আমরা তাকে বেহাত হতে দিই! যত গভীর জলেই ডুব দিক না কেন বাছাধনকে নিশ্বাস নিতে দূরে হোক কাছে হোক কোথাও উঠতেই হবে। খুব বেশীক্ষণ ডুবে থাকাও তার চলবে না, কারণ আমাদের হারপুনের হুমকিতে ভালো করে নিশ্বাস নেবার ফুরসত তার মেলে নি। তিমিরা নিশ্বাস নেবার পর বহুক্ষণ ডুবে থাকতে পারে বটে, কিন্তু পুরোপুরি দম নেওয়া তাদের একেবারে সারা হয় না। জল থেকে হাওয়ায় এসে তারা বারকয়েক ফোয়ারা ছেড়ে, নিশ্বাস নিয়ে তবে আবার অনেকক্ষণের জন্যে ডুব পাড়ে। এ বেচারাকে কিন্তু একটিবার ফোয়ারা ছেড়েই তাড়াহুড়ো করে ডুব দিতে হয়েছে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ ডুব মেরে থাকা সম্ভব হলেও এখন মিনিট দশ-পনরোর বেশী জলের তলায় থাকতে সে পারবে না।

সেনকে কাকের বাসায় পাঠিয়ে হারপুন-কামান ধরে আমি সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সারেঙ আমাদের হুকুমমত তখন মাইলখানেক ব্যাস ধরে জাহাজটাকে চক্কর দেওয়াতে শুরু করেছে।

কিন্তু স্পার্ম-তিমি নয়, নিয়তিই ওই ছদ্মবেশে আমাদের নাকাল করতে এসেছে কি করে বুঝব! তিমির দেখা আমরা আবার কেন, অনেকবার পেলাম, কিন্তু সে যেন মন্ত্রপড়া তিমি, হারপুন দিয়ে তাকে কিছুতেই ছুঁতে পর্যন্ত পারা গেল না। সে যেন ভেলকি জানে। হারপুন-কামান থাকে জাহাজের সামনের দিকে। তিমিটা যেন তা জেনেই প্রত্যেকবার ঠিক জাহাজের পেছন দিকে ভেসে ওঠে। জাহাজ ঘুরিয়ে ভালো করে তাকে তাগ করবার আর সুযোগ মেলে না। তার আগেই সে ডুব দেয়। দু'চারবার এমনি করে

ফসকাবার পর হঠাৎ আমাদের হারপুন-কামানটাই গেল আশ্চর্যভাবে বিগড়ে। কামান মেরামত যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ তিমিটাকে নজরে রাখা ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় নেই। তিমিটা যেন আমাদের মতলব বুঝেই তখন ক্রমশ আরো দক্ষিণে পাড়ি দিতে শুরু করেছে। কিন্তু আমরাও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। হারপুন-কামান ঠিক যদি না হয় তাহলে হাতে-ছোঁড়া হারপুন দিয়েও আগেকার যুগের তিমি-শিকারীদের মত তাকে আমরা ধরবই এই আমাদের পণ।



কিন্তু সে পণরক্ষা আর হল না। দু'দিন দু'রাত্রি তার পিছু পিছু ধাওয়া করে আমরা তখন মেরুবৃত্তের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছি। হঠাৎ তারপর এল ঝড়। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ঝড় যে কি বস্তু, এখানে কল্পনাই করা যায় না। ঘণ্টায় এক শ' মাইল ঝড়ের বেগ সেখানে নেহাত স্বাভাবিক ব্যাপার।

কোথায় রইল তিমি-শিকার, নিজেদের জাহাজ বাঁচাতেই তখন আমাদের

প্রাণান্ত। ক'দিন ক'রাত্রি যে ঝড়ের সঙ্গে যুঝলাম খেয়ালই নেই। এইটুকু শুধু বুঝতে পেরেছিলাম যে ক্রমশ দক্ষিণ দিকেই আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তুষার-ঝড়ে দিগ্বিদিক অন্ধকার, তারই ভেতর উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ আর পাহাড়ের মত বিরাট সব বরফের স্তূপ প্রতি মুহূর্তে যেন আমাদের পিষে ফেলবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে। সে ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত সফলই হ'ল। কয়েকদিন ঝড়ের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধের পর বিরাট এক বরফের পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমাদের জাহাজ চৌচির হয়ে গেল। কি যে তারপর হয়েছে কি যে করেছি কিছুই মনে নেই।

জ্ঞান যখন হ'ল তখন দেখি বিরাট এক তুষার-প্রান্তরের ওপর পড়ে আছি। চোখ মেলতেই মনে হ'ল কেতাদুরস্ত ভাবে ডিনার সুটের সাদা শার্ট কালো কোট-পরা ক'জন ভদ্রলোক যেন আমায় নিবিষ্ট মনে দেখছে।

চোখের ঘোর একটু কাটবার পর বুঝলাম কোটপ্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক নয়, সেগুলি পেঙ্গুইন পাখী।

পেঙ্গুইনরা এই তুষারের রাজ্যে মানুষ কখনো দেখেনি। ভয় না পেয়ে তারা নিজেদের ভাষায় আমার সম্বন্ধে খোলাখুলি ভাবেই তখন আলোচনা শুরু করে দিয়েছে।

উঠে বসে এবার চারিদিকে তাকালাম। আমাদের জাহাজের নানা টুকরো তুষারময় তীরের ওপর চারিদিকে ছড়ানো। বুঝলাম একই ঢেউয়ের মাথায় ভাঙা জাহাজের টুকরোর সঙ্গে আমি এই তুষার-উপকূলে এসে পৌঁছেচি। পেঙ্গুইনদের কথা আগে অনেক শুনেছি। এখানে তাদের আস্তানা দেখে মনে হ'ল রস দ্বীপের কাছাকাড়ি কোন জায়গায় আছি। এ জাতের পেঙ্গুইন এই অঞ্চলেই শীতের আগে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে বড় করতে আসে।

কিন্তু আমি ছাড়া আমাদের জাহাজের আর কেউ কি রক্ষা পায়নি?

চারিধারে অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজে দেখলাম। জীবিত দূরে থাক কোন মানুষের মৃতদেহও একটা দেখতে পেলাম না। দেখবার আশা করাই অবশ্য

ভুল। তুষার-ঝড়ে জাহাজডুবির পর যদি বা কেউ বেঁচে গিয়ে থাকে, এখানকার সমুদ্রের হিংস্র গ্রাম্পস্ তিমির কবল থেকে তার রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। এই দিকের সমুদ্রে নেকড়ের পালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘুরে বেড়ায়। তাদের নজরে পড়লে বিরাট নীল তিমি থেকে অক্টোপাস আর সিল পর্যন্ত কারুর আর রক্ষা নেই। হাঙরের চেয়ে তারা অনেক বেশী বুদ্ধি ধরে ; শক্তি, সাহস এবং হিংস্রতা—তাতেও তারা অনেক ওপরে।

আমি যে তাদের কবলে পড়িনি এটা নেহাত আমার সৌভাগ্য !

কিন্তু খানিকক্ষণ সেই তুষার-শ্মশানে কাটাবার পর বেঁচে যাওয়াটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য বেশ একটু সন্দেহ হ'তে লাগল। জলে ডুবে বা হাঙর-তিমির কবলে পড়ে মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে সব চুকে যেত, কিন্তু সে-সব বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে এই তুষার রাজ্যে যে তিলে তিলে মরতে হবে। এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই কখনো নেই। তিমি-ধরা জাহাজ সাধ করে এ জায়গার ধারে কাছে কখনও আসে না। কালেভদ্রে তোড়জোড় করে যারা মেরু অভিযানে এ অঞ্চলে আসে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা সমুদ্রের বালির গাদায় একদানা চিনি খুঁজে পাওয়ার সমান।

তবু প্রাণ থাকতে হাল ছেড়ে দিতে নেই। যতদিন পারা যায় এই তুষার মরুভূমিতে বেঁচে থাকবার জন্যে যা সাধ্য তাই করবার চেষ্টায় মন দিলাম। জাহাজের ভাঙা যে সব টুকরো-টাকরা চারিধারে ছড়িয়ে ছিল তা থেকে এত সাহায্য পাব ভাবি নি। সে সাহায্য না পেলে একটা দিনও আমায় টিঁকে থাকতে হ'ত না বোধ হয়।

বরফের ওপর ঘুরতে ঘুরতে প্রথমেই পেলাম এই ছড়িটি। সাউথ জর্জিয়ার বন্দর থেকে তিমি-শিকারে বেরুবার সময়ে শখ করে এই ছড়িটি কিনেছিলাম। এই তুষার-রাজ্যে ছড়িটিকে পেয়ে যেন পুরনো বন্ধুকে ফিরে পেলাম মনে হ'ল। ছড়িটি বাদে কিছু টিনে ভর্তি খাবার-দাবারও এখানে সেখানে কুড়িয়ে পেলাম। দিন দশেক অন্ততঃ সে খাবারে চলে যেতে

পারে। কিন্তু সবচেয়ে দরকারী যে জিনিসটি পেলাম সেটি একটি রেশম আর পাতলা রবারের তৈরী গোল তাঁবু। এমনিতে গোটা তাঁবুটা এমন



হালকা যে পাকিয়ে কাঁধে ফেললে একটা আলোয়ানের চেয়ে বেশী ভারী লাগে না। কিন্তু ফাঁপিয়ে মাটিতে খাঁটালে জন চারেক লোক তার মধ্যে অনায়াসে রাত কাটাতে পারে। তিমি-ধরা জাহাজ বিগড়ে হঠাৎ যদি দক্ষিণ

মেরুর কোন দ্বীপে শীতকালটা কাটাতে হয় সেই জন্যে সেন এই তাঁবুটা দেশ থেকে বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে এনেছিল। সেটা যে দক্ষিণ মেরুর তুষার-রাজ্যেই কাজে লাগবে সে বা আমি ভাবতেই পারি নি।

এই তাঁবুটি না পেলে এই রক্ত জমান শীতের দেশে এস্কিমোদের মত বরফের ঘর তৈরি করবার চেষ্টাই হয়তো আমায় করতে হ'ত। তাও কতদূর কি পারতাম জানি না।

তাঁবু খাটিয়ে বসবার পর কয়েকটা দিন ভাঙা জাহাজের টুকরো-টাকরা থেকে আর কি পাওয়া যায় তারই খোঁজে কেটে গেল।

পেঙ্গুইন ও সামুদ্রিক স্কুয়া চিলই আমার একমাত্র সঙ্গী। যে জায়গায় আমি তাঁবু ফেলেছিলাম তা থেকে মাইলখানেক দূরে হাজার হাজার পেঙ্গুইন ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বড় করবার জন্যে তখন নুড়ি সাজিয়ে বাসা তৈরি করতে ব্যস্ত। পুরুষ পাখীরা নুড়ি মুখে করে নিয়ে আসে। মেয়ে পাখীরা তা সাজায়। পেঙ্গুইনদের হাব-ভাব চাল-চলন দেখলে পাখীর বদলে মানুষ বলেই ভুল হয়। তাদের আচার ব্যবহারে সামাজিক সভ্যতার আভাস বেশ স্পষ্ট।

স্কুয়া চিলেরা পেঙ্গুইনদের চিরশত্রু। ইতিমধ্যেই তারা পেঙ্গুইনদের জ্বালাতন করতে শুরু করেছে। পেঙ্গুইনরা ডিম পাড়বার পর তাদের লুটতরাজ আরো বেড়ে যাবে। পেঙ্গুইনদের সজাগ পাহারা একটু ঢিলে হলেই ছোঁ মেরে ঠোঁটে ডিম বিঁধে নিয়ে যাওয়া তাদের দস্তুর।

কিন্তু পেঙ্গুইন আর স্কুয়া চিলের ঝগড়া দেখে দিন কাটালে আমার চলবে না। মাত্র দশ দিনের খোরাক আমার হাতে। পেঙ্গুইনরা ডিম পাড়বার পর স্কুয়া চিলদের মত আমাকেও হয়ত তাদের ওপর ডাকাতি করতে হবে কিন্তু তার আগে কিছু খাবার সংগ্রহ না করলেই নয়। ভাঙা জাহাজের ছড়ানো মাল থেকে একটা লম্বা লোহার সিক যোগাড় করেছিলাম। তাই

দিয়ে এ অঞ্চলের একটা চিতা-সীল শিকার করবার চেষ্টায় বেড়িয়ে পড়লাম। জলে নেমে সড়কিতে সীল মাছ গাঁথা অসম্ভব। কিন্তু সীল অনেক সময়ে বরফের মধ্যে নিশ্বাসের একটা ফুটো তৈরি করে তার তলায় শীতটা কাটায়। সেইরকম একটাকে সুবিধেমত পাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

বরফের ওপর দিয়ে একমনে শিকার খুঁজতে খুঁজতে কতদূর গিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ চোখ তুলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাত্র আধমাইলটাক দূরে বরফের প্রান্তরের ওপর একটা বহুদূরব্যাপী লম্বা সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে। যেন মেঘের একটা লম্বা ফিতে বরফের ওপর নেমে এসেছে।

সীল শিকার মাথায় রইল। এ রহস্যের মীমাংসা আগে না করলে নয়। কাছে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আরো হতভম্ব হয়ে গেলাম। মেঘের ফিতের মত দূর থেকে যা দেখেছিলাম তার তলায় তরতর করে একটা জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে আর সে জল আগুনের মত গরম। এখানকার দারুণ ঠাণ্ডায় সেই জল থেকে বাষ্প উঠে তুষারকণা হয়ে জমে যাবার দরুনই তার চেহারা দূর থেকে মেঘের মত দেখাচ্ছে।

এই তুষার-রাজ্যে এরকম জলের স্রোত কোথা থেকে আসছে?

সেদিন তৈরী ছিলাম না। তাই পরের দিন লম্বা পাড়ির জন্যে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে পড়লাম। প্রস্তুত হওয়া মানে আর কিছুই নয়, কাঁধের একটা ঝোলায় টিনের খাবারের কৌটোগুলো, কোমরে চাদরের মত জড়ানো সেই তাঁবু, আর হাতে এই ছড়ি। যদি দরকার হয় যেখানে খুশি তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাতে পারব এই জন্যেই এসব নেওয়া।

ঘণ্টা চারেক বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবার পর গরম জলের স্রোতের রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল বটে কিন্তু যা দেখলাম সে আরেক বিস্ময়।

সামনে তুষার-প্রান্তর ঢালু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে আর তারই মাঝে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক খাড়া পাহাড়ের চূড়া। পাহাড়

এখানে চারিদিকেই কিন্তু সেগুলি আগাগোড়াই বরফে ঢাকা। এই পাহাড়ের গায়ে শুধু নেড়া পাথর ছাড়া একটি বরফের কুচিও নেই। এই পাহাড়েরই নিচের দিকের একটি গুহা থেকে ফুটন্ত গরম জলের স্রোত বেরিয়ে আসছে তা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণ মেরুতে মাউণ্ট ইরেবাস ও আরেকটি আগ্নেয়গিরি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আগেই জানতাম। আমি কি তাহলে ভাগ্যক্রমে সে দু'টির চেয়েও আশ্চর্য আরেকটি আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করে ফেলেছি! আনন্দের সঙ্গে দুঃখও হ'ল এই যে এ আবিষ্কারের কথা পৃথিবীর কেউ জানতেও পারবে না। এই তুষার-রাজ্যে এ আবিষ্কার আমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে।

তবু এ আগ্নেয়গিরির সন্ধান ভালো করে না নিয়ে ফিরতে পারি না।

সামনের দিকে পাহাড় অত্যন্ত খাড়াই। ডানদিকের পাহাড় কিছুটা ঢালু দেখে সেই দিক্ দিয়েই উঠতে শুরু করলাম।

ওপরে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন দক্ষিণ মেরুর এই সময়কার ছোট রাত শুরু হয়ে গেছে। সন্তর্পণে কিছুদূর যেতেই আগ্নেয়গিরির বিরাট মুখটার প্রান্ত দেখা গেল। সাধারণ আগ্নেয়গিরির চেয়ে এই পাহাড়ের হাঁ অনেক বেশী প্রকাণ্ড।

কিন্তু ঠিক মুখটার কাছে ওটা কি প্রাণী!

দক্ষিণ মেরুতে পেঙ্গুইন ছাড়া ডাঙায় চরবার মত কোন প্রাণীই নেই জানি। এ বিশাল প্রাণীটা তা হলে কোথা থেকে এল? আবছা অন্ধকারে সেটাকে প্রকাণ্ড একটা পাখী বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু এত বড় আকারের কি-পাখী এখানে থাকতে পারে! দক্ষিণ মেরুর সম্রাট পেঙ্গুইনই সবচেয়ে বড় আকারের পাখী, কিন্তু সে পাখীও ত কখনো এত বিশাল হতে পারে না। তাছাড়া সেরকম পাখী একলা এই পাহাড়ের চূড়ায় কি করে আসবে!

ভালো করে একটু খোঁজ নেবার জন্যে সন্তর্পণে যেই একটু এগিয়েছি, অমনি বিরাট পাখীটা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কি একটা চীৎকার করে উঠল।

পরমুহূর্তে হঠাৎ চমকাবার দরুনই হোক বা তলার পাথর সরে গিয়েই হোক সে সশব্দে আগ্নেয়গিরির মুখের ভেতর গড়িয়ে পড়ল এবং এক লাফে তাকে ধরতে গিয়ে দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে আমিও সবেগে নিচে গড়িয়ে যাচ্ছি।



একেবারে নিচে এসে গড়িয়ে পড়ার পর জখম খুব বেশী না হলেও আরেক দিক্ দিয়ে অবস্থা যা হল তা বর্ণনা করা যায় না।

দারুণ গ্রীষ্মের দিনে দার্জিলিঙ থেকে শিলিগুড়িতে নামলে যে অবস্থা হয় তা এর কাছে কিছুই নয়। পাহাড়ের ওপর ছিল দক্ষিণ মেরুর দুরন্ত শীত আর পাহাড়ের এই গহ্বরের তলায় একেবারে যেন আফ্রিকার কঙ্গোর

জঙ্গলের দারুণ ভ্যাপসা গরম। সমস্ত শরীর জ্বলে গিয়ে যেন দম বন্ধ হয়ে মরে যাবার যোগাড় হল।

যার জন্যে এই গহ্বরে পড়তে হল সেও তখন উঠে বসে আমার দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছে। বিরাট কোনো অজানা পাখী নয়, সে আমারই বন্ধু সেন।

সেনের মুখে সমুদ্র থেকে উদ্ধার পাওয়া আর পাখী সাজার বৃত্তান্ত তারপর শুনলাম। আমার মত সমুদ্রের ঢেউ তাকেও তুষার-তীরের ওপর ফেলে যায়। কিন্তু আমার মত রবারের তাঁবুর সুবিধে না থাকায় শীতে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কয়েকটা পেঙ্গুইন পাখা মেরে তাদের চামড়া আর পালক তাকে গায়ে আঁটতে হয়। তারপর গরম জলের স্রোত দেখে আমারই মত কৌতূহলী হয়ে সে এই পাহাড়ের সন্ধানে আসে।

অন্য সময় হ'লে এ গল্প হয়ত যথেষ্ট উপভোগ করতাম, কিন্তু দারুণ গরমে যখন প্রাণ যাবার উপক্রম তখন অন্য কিছুতে কি মন যায়!

দু'দিন দু'রাত সেই আগ্নেয়গিরির খোল থেকে বেরুবার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন ফল হল না। চারধারে পাথরের দেওয়াল কতকটা ঢালু হলেও এমন উল্টোভাবে খাঁজকাটা যে তা বেয়ে গড়িয়ে পড়া সহজ হলেও ওঠা একেবারে অসম্ভব।

ইতিমধ্যে আগ্নেয়গিরির গরম জলের স্রোতের রহস্য আমরা বুঝে ফেলেছি। যে খোলের ভেতর আমরা পড়েছি তার দু'দিকে দুটি ছোট ছোট ফোকর আছে। একদিকের ফোকর দিয়ে বাইরের তুষার ভেতরে এসে মাঝখানের একটা কড়াই-এর মত গর্তে জমা হয়ে নিচেকার প্রচণ্ড উত্তাপে ফুটে উঠছে। তারপর সেই ফুটন্ত জল আর একদিকের ঢালু ফোকর দিয়ে স্রোত হয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে। নামবামাত্র একেবারে সেদ্ধ হয়ে যাবার ভয় না থাকলে সেই স্রোতের জলের সঙ্গেই বেরুবার চেষ্টা হয়ত আমরা করতাম, কিন্তু তার কোনো উপায় নেই।

এদিকে প্রচণ্ড গরমে মারা যাবার আগেই আমাদের পাগল হবার উপক্রম। আগ্নেয়গিরিটা এখনও একরকম ঘুমন্ত বলা চলে। স্রোতের জলকে ফুটিয়ে তোলা ছাড়া তার অন্য কোন উপদ্রব এখনও দেখা দেয়নি। কিন্তু দেখা দিতে কতক্ষণ!



বাইরের তুষার-প্রান্তরে থাকলেও খুব বেশী দিন আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না জানি, কিন্তু এই বদ্ধ গুহায় মরার চেয়ে সে যেন অনেক ভালো।

দু'দিন দু'রাত ধরে এ গহ্বর থেকে বেরুবার ব্যর্থ চেষ্টায় হয়রান হয়ে সেনকে সেই কথা বলতে গিয়ে রাগের মাথায় ছড়িটা যেই গহ্বরের মেঝেতে ঠুকেছি অমনি এক ভয়ংকর আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল।

দমকলের মুখ দিয়ে যেমন তোড়ে জল বেরোয় আমার ছড়ির ডগায় মেঝের সেই জায়গাটা ফুটো হয়ে তেমনি প্রচণ্ড বেগে সাতটা ইঞ্জিনের শিষের মত আওয়াজ করে ধোঁয়াটে গ্যাসের পিচকিরি আগ্নেয়গিরির মুখ ছাড়িয়ে লাফিয়ে উঠল। গ্যাসের সে ফোয়ারা আর থামে না!

সেই গ্যাসের তোড়েই সে যাত্রা বেঁচে গেলাম—বলে ঘনাদা থামলেন।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, গ্যাসের তোড়ে বাঁচলেন কি রকম?

একটু অনুকম্পার হাসি হেসে ঘনাদা বললেন,—এটা আর বুঝতে পারলে না? কোমরে যে তাঁবুটা বাঁধা ছিল সেটা খুলে ধরে গ্যাসে ভর্তি করে নিলাম।

তারপর দুজনে সেই বেলুনের দু'দিকে দড়ি দিয়ে নিজেদের বেঁধে হাওয়ায় ভেসে গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম।

এই বেলুনেই দক্ষিণ মেরু থেকে দেশে পৌঁছলেন নাকি?—গৌর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

না, ও বেলুনে আর কতদূর যাওয়া যায়! ঘনাদা একটু যেন বিরক্ত হয়ে বললেন,—সে বেলুন থেকে গিয়ে পড়লাম এক পাহাড়ের ওপর। সাধারণ পাহাড় সেটা নয়,—বিরাট Iceberg অর্থাৎ বরফের পাহাড়। এই সময়ে এই সব বরফের পাহাড় ঝড়ের বেগে ক্রমশ উত্তর দিকে ভেসে যেতে যেতে গলতে থাকে। আমাদের পাহাড়টা যখন গলতে গলতে কোনরকমে দুজনের দাঁড়াবার মত ছোট হয়ে এসেছে তখন ভাগ্যক্রমে একটা তিমি-ধরা জাহাজ সেইখান দিয়ে যেতে যেতে আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের তুলে নেয়। আমরা ভাসতে ভাসতে যে ম্যাকওয়ারী দ্বীপ পর্যন্ত এসে পড়েছিলাম তা ভাবতেও পারি নি।

ঘনাদা বলা শেষ করে শিশিরের দিকে ২৩৯৯তম সিগারেট ধার করবার জন্যে হাত বাড়ালেন।

গৌর হঠাৎ বলে উঠল,—ছড়িটা আপনি সাউথ জর্জিয়া থেকে কিনেছিলেন বললেন না! আমাদের পাড়ার মিত্র ব্রাদার্সও বোধহয় সেখান থেকে ছড়ি আমদানি করছে আজকাল। ঠিক এইরকম ছড়ি সেখানে কটা দেখলাম যেন!

ঘনাদার সিগারেট ধার করা আর হল না। আমাদের বিশেষ করে গৌরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।



ঘনাদা গম্ভীরভাবে বললেন, 'না, প্লেন নয়, লাট্টু।'

কোন্ সূত্রে আমাদের একেবারে থ' করে দিয়ে ঘনাদা এ-কথা বললেন, সেইটে আগে তাহ'লে বলি।

পুজোর সময় দার্জিলিং যাবার কথা হচ্ছিলো। ট্রেনে যাওয়ার হাঙ্গামও যত, সময়ও তত বেশী লাগে। তাই প্লেনেই যাবার ব্যবস্থা ঠিক করছিলাম। ট্রেনেই হোক আর প্লেনেই হোক ঘনাদার পক্ষে একই কথা হওয়া উচিত। কারণ, আসলে পরস্মৈপদী হয়ে তিনি আমাদের ঘাড়ে চড়েই যাবেন। ঘাড় অবশ্য আমরা সাধ করেই পেতে দিয়েছি, বিদেশে তিনি সঙ্গে থাকলে একটু ভালো জমবে বলে'। কিন্তু প্লেনের নাম শুনেই তিনি এমন বেঁকে দাঁড়াবেন কে জানতো।

গৌর একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'প্লেনে যেতে আপনার আপত্তিটা কি? কোথায় একরাত একবেলা টিকিয়ে-টিকিয়ে যেতেন; তার বদলে, ঘণ্টা-দেড়েকেই সব ঝামেলা শেষ।

ঘনাদার কিন্তু তবু ধনুক-ভাঙা পণ, প্লেনে তিনি কিছুতেই চড়বেন না।

অনেকক্ষণ ধরে রাজী করাবার চেষ্টা করে আমরা শেষ পর্যন্ত চটেই গেলাম। শিবু তো বলেই ফেললে,—ঘনাদার বোধ হয় ভয় করে প্লেনে!

ঘনাদা তার দিকে যে দৃষ্টিটা হানলেন, তাতে শিবুর ভস্ম হয়ে যাবার কথা। কিন্তু শিবুর বোধ হয়, অ্যাসবেস্টসের চামড়া। এ দৃষ্টির সামনেও বেশ অক্ষত থেকে সে আবার অম্লানবদনে জিজ্ঞাসা করলে,—'প্লেনে কখনও চড়েন নি বুঝি, ঘনাদা?'

শুধু চোখের দৃষ্টিতে এ অপমানের উত্তর দেওয়া যায় না, তাই ঘনাদা এবার মুখ খুললেন। যতখানি সম্ভব অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন,—'প্লেনে চড়া ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছেন? কি দুঃখে?'—এবার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা শিশিরের।

এর ওপর আবার একটু ফোড়ন দিয়ে গৌর বললে,—'অত ধীরে-সুস্থে যাওয়া বোধ হয় ঘনাদার পছন্দ না। ঘণ্টায় মাত্র তিন চার শ' মাইলে কি ঘনাদার পোষায়!'

'আহা, তিন চার শ' কেন?'—শিবু প্রতিবাদ করলে, 'জেট্-প্লেন তো রয়েছে! ঘণ্টায় শুনি, ছ শ' মাইলও ছাড়িয়ে যায়।'

ঘণ্টায় ছ শ' মাইলের ওপর শুনেও ঘনাদার মুখে যে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠলো তাইতে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'ঘনাদা যে জেট্-প্লেনে চড়েছেন, তার বেগ বুঝি এর চেয়েও বেশী?'

ঘনাদা আমাদের স্তম্ভিত ক'রে বললেন,—'হ্যাঁ, কিন্তু তা জেট্-প্লেন নয়।'

'জেট্-প্লেন নয়? তাহ'লে অন্য কোন প্লেন তো বটে?'—আমরা হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

কয়েক সেকেণ্ড আমাদের দিকে অনুকম্পাভরে তাকিয়ে ঘনাদা বললেন, 'না, প্লেন নয়, লাট্টু।'

এই লাট্টু শুনেই বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আমাদের মুখে আর কথাই সরলো না।

ঘনাদাই এবার করুণা করে' তাঁর মন্তব্য পরিষ্কার ক'রে বললেন,—'হ্যাঁ, লাট্টু,—কিন্তু সে শুধু চেহারায়। তবে লেত্তি দিয়ে লোহার আলবাঁধা যে লাট্টু ছেলেবেলা ঘুরিয়েছো সে লাট্টু নয়, অনেকটা ছোটদের খেলার কলের লাট্টুর মত—চেপ্টা চাকতির মত সেগুলো দেখতে।'

এ পর্যন্ত শুনেই আমরা তখন পরে কি আসছে বুঝে, প্রস্তুত হয়ে বসে গেছি। আমাদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ঘনাদা শুরু করলেন,—'চার বছর আগে জানুয়ারী মাসের এক দুপুরবেলা ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় ত্রিশ জন যাত্রী নিয়ে যেতে-যেতে একটি মাঝারি আকারের ড্যাকোটা বিমান আশ্চর্যভাবে যে নিখোঁজ হয়, এ খবর অনেকেরই হয়তো আর মনে নেই। এ দেশে না হোক, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এই নিয়ে তখন কিন্তু দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এ উত্তেজনা কিন্তু বেশী দিন থাকে নি। প্লেনের মালিকেরা ও মার্কিণ সামরিক-বিভাগ একটা কৈফিয়ত দিয়ে সকলকে ঠাণ্ডা ক'রে দিয়ে দিলেন। কৈফিয়তটা কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা।

উড়ো জাহাজটির নিখোঁজ হওয়া সত্যিই একটু অদ্ভুত ধরনের। জল-ঝড় নেই, প্লেনের যন্ত্রপাতির কোনো গোলমাল হয় নি, তবু একেবারে আমেরিকার কূলের কাছে এসে শূন্য-আকাশে সকলের চোখের সামনে যেন উড়োজাহাজটি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

সকলের চোখের সামনে কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলছি মাত্র। সত্যি-সত্যি চর্মচক্ষে না দেখলেও, অন্ততঃ দুটো এরোড্রোম ও একটি বোমারু-বিমানের 'র‍্যাডার-স্ক্রীন' তখন সেই প্লেনটির সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

এই ঘটনার আধ মিনিট আগেও যাত্রীবাহী প্লেনটির সঠিক অবস্থান জানা গিয়েছে। ক্যানাডার পূর্বদিকে সমুদ্রের একেবারে ধারে—নোভা স্কোসিয়া। সেই নোভা স্কোসিয়ার লিভারপুলে, নয় হ্যালিফ্যাক্সের উড়ো জাহাড়ের ঘাঁটিতেই যে প্লেনটি নামতে যাচ্ছে, সে কথাও তখন অজানা নেই। কিন্তু তারপরই

লিভারপুল ও হ্যালিফ্যাক্স দুই জায়গার এরোড্রোমের র‍্যাডার-স্ক্রীন হঠাৎ অদ্ভুতভাবে নীরব হয়ে গেছে।

ইংলণ্ড থেকে আমেরিকা যাবার প্লেন, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ঘাঁটিতে না নেমে, নিরাপদ অবস্থাতেও ক্যানাডার মাটিতে কেন নামতে যাচ্ছিলো সেটা একটা রহস্য মনে হতে পারে। যে কাহিনী বলতে যাচ্ছি, ওই রহস্যটুকু গোড়ায় না থাকলে তার সূত্রপাতই হতো না।

ইংলণ্ডের ক্রয়ডেন-এরোড্রোম থেকে উড়োজাহাজটি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশেই রওনা হয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পার হবার পরই প্লেনের বেতার-যন্ত্রী একটি জরুরী আদেশ পায় ইংলণ্ড থেকে—প্লেন যেন অবিলম্বে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে আনা হয়।

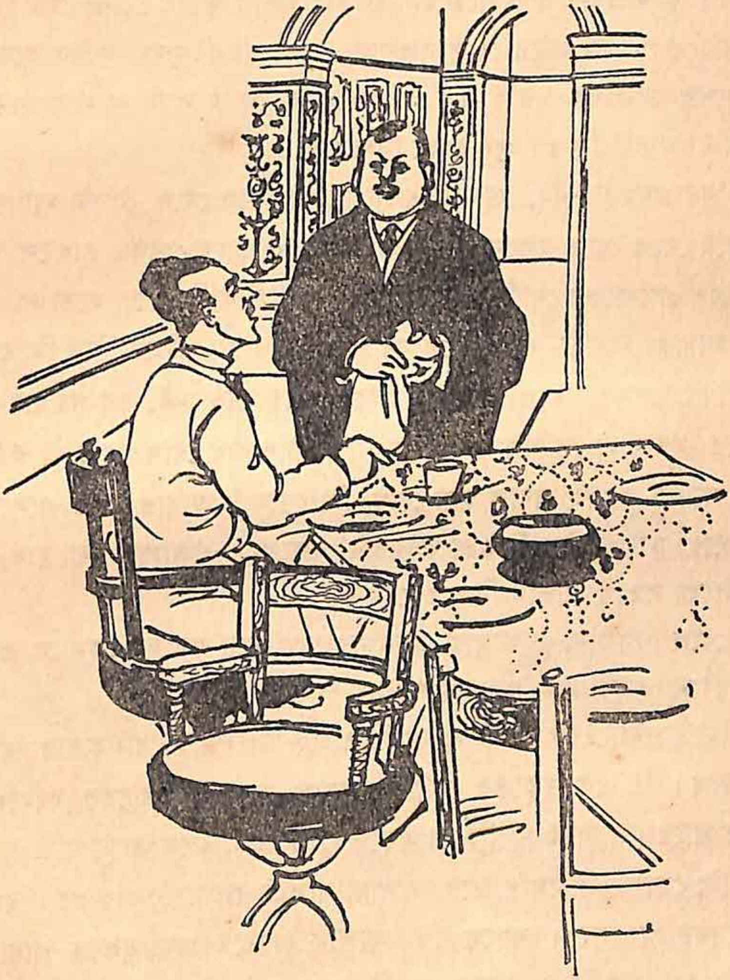
আদেশের মর্ম না বুঝলেও, প্লেনের পাইলটের তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। ইংলণ্ডের দিকেই আবার প্লেনের মুখ তাই ঘোরানো হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে বিস্মিত ও বিরক্ত হওয়া যাদের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই যাত্রীরা খানিক বাদেই বুঝতে পারে যে, কিছুদূর গিয়েই প্লেন আবার আমেরিকার দিকেই ফিরছে।

ব্যাপারটা তাদের কাছে দুর্বোধ হলেও, ইংলণ্ডের সামরিক ও পুলিশ-বিভাগের কর্তাদের কাছে তখন আর নয়।

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যক্রমে জানি না, ক্রয়ডেনের পুলিশকর্তা মিঃ ডোনাটের বাড়ী সেইদিনই আমি অতিথি। মিঃ ডোনাট্ এককালে নিউগিনির পোর্ট মোরেসবি বন্দরে কাজ করতেন। সেখানে গত যুদ্ধের আগে একটি জাপানী গুপ্তচরদের চক্রান্ত ধরে দেওয়ার ব্যাপারে আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম। মিঃ ডোনাট্ সে ঋণের কথা ভোলেন নি। যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে একরকম বেড়াতেই গেছি। কি ক'রে জানি না, আমার খোঁজ পেয়ে ডোনাট্ সাদরে তাঁর বাড়ীতে আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান।

সাদর নিমন্ত্রণ করলেও, অতিথির সম্মান রাখা সেদিন তাঁর ভাগ্যে নেই।

খাবার টেবিলে বসে সবে স্যুপের প্লেট শেষ করেছি, এমন সময় পাশের ঘরে তাঁর ফোন বেজে উঠলো। মিঃ ডোনাট্ বিরক্ত হয়েই খাবার ফেলে উঠে



গেলেন, কিন্তু ফোন সেরে ফিরে যখন এলেন তখন তাঁর মুখ আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর।

'কি ক'রে আপনার কাছে যে ক্ষমা চাইবো বুঝতে পারছি না, মিঃ দাস, কিন্তু আপনাকে একলা ফেলে এখুনি আমার না গেলে নয়।'—মিঃ ডোনাট্ যে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন তা তাঁর গলার স্বরেই বোঝা গেল।

তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে হেসে বললাম,—'আপনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। পুলিশের চাকরির মজাই যে এই, তা কি আমি জানি না মনে করেছেন! এখন ব্যাপারটা কি? খুন-জখম নিশ্চয়?'

'খুন-জখম!'—মিঃ ডোনাট একটু দুঃখের হাসি হেসে, টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'খুন-জখম হলেই ভালো হতো, তাহ'লে অন্ততঃ এই এক সেকেণ্ডের নোটিশে, তিন হাজার মাইল পাড়ি দিতে হতো না।'

আমার মাথাটি কথার শেষের এই ধাঁধায় গুলিয়ে দিয়ে মিঃ ডোনাট্ বেরিয়ে গেলেন। খাওয়ায় তখন আর আমার রুচি নেই, তবু গৃহস্বামীর মান রাখতে যথাসাধ্য সেদিকে মন দিয়ে ব্যাপারটার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খানিক বাদেই অবাক্ হয়ে দেখি, মিঃ ডোনাট্ আবার ফিরে এসেছেন।

ঘরে ঢুকেই উত্তেজিতভাবে তিনি বললেন,—'আচ্ছা, মিঃ দাস, সেনর গ্যালিকো সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?'

হেসে বললাম,—'আমায় এমন সবজান্তা মনে করছেন কেন যে, দুনিয়ার যে-কোনো একটা নাম শুনলেই পরিচয় বলতে পারবো?'

মিঃ ডোনাট্ বেশ একটু অধৈর্যের সঙ্গেই বললেন,—'রসিকতার সময় নেই মিঃ দাস। দু'এক মুহূর্তের দেরিতে হয়তো সমস্ত ইউরোপের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। সেনর গ্যালিকো সম্বন্ধে যা জানেন, বলুন তাড়াতাড়ি।'

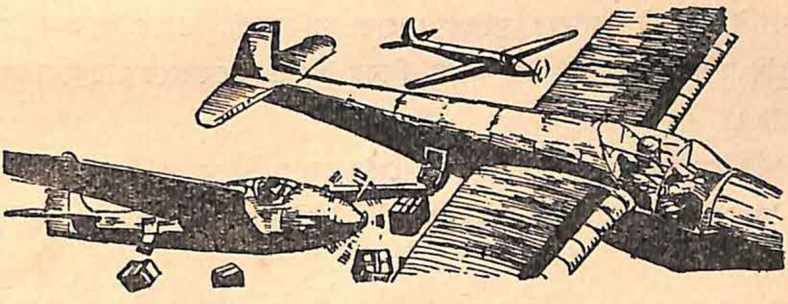
মিঃ ডোনাটের গলার স্বরে বুঝলাম, সত্যিই ব্যাপারটা গুরুতর। বললাম, —'সেনর গ্যালিকো সম্বন্ধে কি আপনি জানতে চান, বুঝতে পারছি না। গ্যালিকো তার শত নামের একটি মাত্র, একটা নিশ্চয় জানেন? দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত অত বড় গুপ্তচর যে জন্মায় নি, তাও নিশ্চয় আপনাকে বলে দিতে হবে না।'

'হ্যাঁ, সে-সব জানি। কিন্তু গত যুদ্ধের শেষ দিকে প্লেন থেকে সাবমেরিনে ব্রেজিলে পালাতে গিয়ে সে যে সাবমেরিনডুবি হয়ে মারা যায় বলে' খবর রটেছিল, তা সত্যি কিনা ?'

'সে কথা তো আমার চেয়ে আপনাদেরই ভালো জানবার কথা।'

মিঃ ডোনাট্ট এবার বেশ বিরক্ত হয়েই উঠলেন, 'কেন মিছে কথা বাড়াচ্ছেন, মিঃ দাশ ! যদি কিছু জানেন তো, তাড়াতাড়ি বলুন।'

মিঃ ডোনাটের বিরক্তিতে হেসে ফেলে বললাম,—'বেশ, বলছি শুনুন। সেনর গ্যালিকো সাবমেরিনডুবি হয়ে মারা যায়নি। নিজের মৃত্যুর মিথ্যে খবর রটিয়ে সে এতদিন বেশ বহাল-তবিয়তে আর্জেনটাইনে কাটিয়েছে বলেই আমি জানি। কিন্তু এতবড় জরুরী খবর যার কাছে জেনে নিচ্ছেন, ব্যাপারটা আসলে কি, তার তা জানবার অধিকার নেই ?'



'খুব আছে। সব কথা, যেতে-যেতেই বলবো। আসুন।'

অবাক্ হয়ে বললাম,—"সে কি ! আমি যাবো কোথায় ?"

'কোথায় তা এখনও জানি না। কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে আমার সঙ্গে মিঃ দাশ। সেনর গ্যালিকোর ছদ্মবেশ ভেদ করে তাকে চেনার মত দ্বিতীয় লোক এখন আর আমাদের হাতের কাছে নেই।'

গাড়ী বাইরেই তৈরী ছিল। রাস্তার নিয়মকানুন, হেলায় লণ্ডভণ্ড করে'

দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে সে গাড়ী, মিনিট কয়েকের মধ্যেই দেখলাম, ক্রয়ডেন এরোড্রোমেই আমাদের পৌঁছে দিলে।

সেখানে নেমে, বৃটিশ সামরিক-বিভাগের যে মহাশয় ব্যক্তিটিকে দেখা গেল, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর না হোলে তিনি সশরীরে সেখানে হাজির থাকতেন না।

আমাকে দেখে মিঃ ডোনাট্‌কে কাছে ডেকে তিনি নীচু-গলায় কি জেনে নিলেন, তারপর এগিয়ে এসে আমার করমর্দন করে' বললেন,—'আপনি যে সাহায্য আমাদের করতে এসেছেন, তার জন্যে সমস্ত ইউরোপ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।'

হঠাৎ শিবুর কাশিতে ঘনাদার কথায় ছেদ পড়লো। শিবুর কাশির ধরনটা সত্যি বড় বেয়াড়া। হাসি চাপতে গিয়ে কাশি বলে' যদি কেউ তাকে সন্দেহ করে, তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

কাশি শুনেই ঘনাদার মুখের চেহারা যা হলো, তাতে মাঝ-নদীতে ভরাডুবি হবার ভয়ে আমরা সবাই শিবুর ওপর একেবারে মারমুখো হয়ে উঠলাম।

'কাশবার আর সময় পেলি না!' গৌর ধম্‌কে উঠলো।

'অত যদি কাশি, তো 'বাসক সিরাপ' খেলেই হয়।' শিশির মন্তব্য করলে রূঢ়ভাবে।

'কাশি পায় তো, বাইরে গিয়ে বোস্!'—আমিও বকুনি দিতে ছাড়লাম না।

বলা বাহুল্য, শিবুর কাশি তৎক্ষণাৎ থেমে গেল এবং ঘনাদা শান্ত হয়ে আবার শুরু করলেন:—

হেসে তখন বললাম,—'ইউরোপের কৃতজ্ঞতায় আমার কোনো লোভ নেই। গ্যালিকোর কাছে আমার একটা পুরনো দেনা আছে শোধ দেবার; আমি সেই আশাতেই যাচ্ছি।'

কিছু দূরে যে বিরাট অদ্ভুত চেহারার প্লেনটা দাঁড়িয়েছিল, সেই দিকেই এবার সবাই অগ্রসর হলাম।

প্লেনের কাছে এসে দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে পড়ে' সামরিক-বিভাগের বড়-কর্তা আমায় বললেন,—'একটা বিপদের কথা কিন্তু আপনাকে আগে বোধহয় জানিয়ে দেওয়া দরকার, মিঃ দাশ। মিঃ ডোনাট্ তাঁর দেশের জন্যে কর্তব্যের ডাকে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনি এসেছেন, স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে। যে প্লেনে আপনাদের পাঠাচ্ছি—'

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে হেসে বললাম,—'সেটা কয়েকদিন আগে টেম্‌সের খাঁড়ির ওপর যে জেট্-প্লেন ফেটে গিয়ে মিঃ জিওফ্রে ডে হ্যাভিল্যাণ্ড প্রাণ হারান, তারই যমজ বলা যায়। আমি দেখেই তা চিনেছি। সুতরাং আপনার সংকুচিত হবার কিছু নেই।'

সামরিক বড়-কর্তার নির্বাক বিস্ময়টুকু উপভোগ করেই প্লেনের ভেতরে গিয়ে উঠলাম।

শব্দের চেয়ে যা আগে ছোটে, সেই সুপারসোনিক জেট্ বম্বার-এ উল্কাবেগে অতলান্তিক সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে-যেতে ডোনাটের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই ভালো করে জেনে নিলাম।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—কিছুদিন থেকেই ইংলণ্ডের কর্তাব্যক্তিরা সন্দেহ করছিলেন যে অত্যন্ত চতুর কোন গুপ্তচরের কারসাজিতে সামরিক-বিভাগের অত্যন্ত গোপন সব সংবাদ কিভাবে যেন অদৃশ্য ছিদ্র-পথে বার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আগের দিনই সে সন্দেহ যে মিথ্যা নয়, তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশরক্ষা-বিভাগের একজন বড়-কর্তার সুরক্ষিত সিন্দুক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান একটি তাড়া কাগজ আশ্চর্যভাবে উধাও হয়ে গেছে। 'ফাইল'টি তার আগের দিনই সে-সিন্দুকে রাখা হয়। এ 'ফাইলে' এমন কিছু আছে, শত্রুপক্ষ যা জানতে পারলে শুধু ইংলণ্ড নয়,—

ইউরোপেরও সর্বনাশ হয়ে যাবে। খবরের কাগজে এসব কথা জানানো যায় না। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ তাই গোপনে যা করবার সবই করেছে। ফাইল কিভাবে চুরি গেছে তারা এখনও বুঝতে পারেনি, কিন্তু 'ফাইল'-এর সঙ্গে দেশরক্ষা-বিভাগের অফিস থেকে নগণ্য যে একজন চাকর উধাও হয়ে গেছে,—তার খোঁজ করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে গোখরোর সন্ধান তারা পেয়েছে। চুরির অপরূপ কৌশল দেখে তাদের ধারণা হয়েছে যে, বিশ্ববিখ্যাত গুপ্তচর সেনর গ্যালিকোরই কাজ এটা। কিন্তু সেনর গ্যালিকো বছর চারেক হোলো মারা গেছে বলে সবাই জানে। তা সত্ত্বেও এ মূল্যবান কাগজপত্র যেসব পথে ইংলণ্ড থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, তার সবগুলির ওপরই গোয়েন্দা-বিভাগ কড়া নজর রেখেছে। যে প্লেনটি ক্রয়ডেন থেকে আমেরিকায় রওনা হয়, তার যাত্রীদের মধ্যেও একজন গোয়েন্দাকে সেজন্যে রাখা হয়। প্লেনটি ছাড়বার সময় তার সমস্ত যাত্রীর পরিচয়ই অবশ্য ভালো করে' খুঁটিয়ে দেখা হয়। তাদের কারুর পরিচয়েই কোনো খুঁত পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও প্লেনটি ছেড়ে যাবার পরই গোয়েন্দা পুলিস এমন একটি সূত্র পায়, যাতে মনে হয়, ওই প্লেনেই গুপ্তচর তার চুরির মাল নিয়ে পালিয়েছে। তৎক্ষণাৎ বেতার-টেলিগ্রামে প্লেনটিকে তাই ফিরে আসবার আদেশ দেওয়া হয়। প্লেনটি ফিরেও আসছিল, কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে কি যে হয় কিছুই বোঝা যায় না। প্লেনটি ইংলণ্ডের দিকে না এসে, আবার ওপারের দিকেই যাত্রা করে। আমেরিকা ও কানাডার পূর্ব উপকূলের সমস্ত এরোড্রাম ও সামরিক ঘাঁটিকেই তখন সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, প্লেনটির অপেক্ষায় সতর্ক থাকবার জন্যে। গুপ্তচর যদি সেনর গ্যালিকোই হয়,—তাহ'লে অবশ্য তার মত ধড়িবাজ না বার করতে পারে, এমন ফন্দি নেই। বিরাট আমেরিকার পূর্ব-উপকূলে যে কোনো জায়গায় নেমে সে সরে' পড়তে পারে। তাই আমেরিকার যেখানে যত ঘাঁটি আছে, তারা তো র‍্যাডার-স্ক্রীনে আকাশের সমস্ত দিকের ওপর কড়া নজর রাখছেই, আমাদের এই

পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী সুপারসোনিক বম্বারও পেছনে ছুটছে তাকে ধরবার জন্যে। যাত্রীবাহী প্লেনটি কয়েক ঘণ্টার সুবিধে পেয়েছে সত্য, কিন্তু তার দৌড়, ঘণ্টায় বড়-জোর সাড়ে-তিন শ মাইল। আমাদের জেট-বম্বার যে ভাবে দূরত্বকে গিলে খায়, তাতে কয়েক ঘণ্টার তফাত তার কাছে কিছু নয়।

কথাটা যে কতখানি সত্য, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আমাদের র‍্যাডার-অপারেটার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে জানালে, তার র‍্যাডার-স্ক্রীনে একটি উড়ো জাহাজের সন্ধান সে পেয়েছে। আমরা যাকে শিকার করতে যাচ্ছি, সেই যাত্রীবাহী প্লেনটি বলেই মনে হয়। আমাদের বম্বারের বেগ, পাঁচ শ থেকে ছ' শ মাইল বাড়িয়ে দেওয়া হলো। আমরা আমেরিকার উপকূলের কাছে এসে পড়েছি। আর খানিক বাদে শুধু র‍্যাডার-স্ক্রীনে নয়, প্লেনটিকে—চোখেই বোধ হয় দেখা যাবে।

মিঃ ডোনাট্ ও আমি তখন র‍্যাডার-যন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তার স্ক্রীনের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছি।

মিঃ ডোনাট্ বুঝি কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে সামনের কাঁচের ভেতর দিয়ে বাহিরের দিকে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন,—'ওটা আবার কি !'

চম্‌কে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে যা দেখতে পেলাম, তাতে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। উইণ্ড-শিল্ডের কাঁচের ভেতর দিয়ে, সামনের সমস্ত আকাশটাই দেখা যায়। সেই আকাশ-পটের এক প্রান্ত থেকে একটি অদ্ভুত আকারের জিনিস প্রায় বিদ্যুৎগতিতে—আমাদের সামনে দিয়ে দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল।

আমরা যা খালি চোখে দেখেছি, র‍্যাডার অপারেটারও তার পর্দায় তার আভাস তখন পেয়েছে। অবাক্ হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে,—'এটা আবার কি ব্যাপার ! বিরাট কোনো উল্কা নাকি !'

উল্কা যে হতেই পারে না, তা তখন ভালো ভাবেই বুঝেছি। কিন্তু সুপারসোনিক জেট্‌বম্বারকে দ্রুতগতির পাল্লায় যা গরুর গাড়ীর মত পেছনে ফেলে যেতে পারে—সে আকাশ-যান যে কি ও কাদের হতে পারে, ভেবে কোনো হদিস্ পেলাম না।

যত অদ্ভুত ব্যাপারই হোক, আমরা যে উদ্দেশ্যে চলেছি, তা ছাড়া অন্য কিছুতে আমাদের মন দেওয়া তখন উচিত নয়। কিন্তু হঠাৎ সে-দিকেও আশ্চর্যভাবে বাধা পাবো কে জানতো!

র‍্যাডার-স্ক্রীন থেকে বুঝতে পারছিলাম, আমাদের সামনের প্লেনটি আর বেশী দূরে নেই। বড়-জোর কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই তাকে আমরা ধরে ফেলবো। কিন্তু হঠাৎ আমাদের স্তম্ভিত করে' র‍্যাডার-স্ক্রীনটা যেন ঝাপসা হয়ে গেল। যন্ত্রপাতির কোনো গোলোযোগ মনে করে' অপারেটার সব-কিছু প্রাণপণে পরীক্ষা করে দেখলে, কিন্তু সেখানে কোনো ত্রুটিই পাওয়া গেল না।

কয়েক সেকেণ্ড বাদে,—যেভাবে ঝাপসা হয়ে গেছলো, সেইভাবেই পর্দা আবার পরিষ্কার হয়ে গেল বটে, কিন্তু চতুর্দিকে র‍্যাডার-তরঙ্গ পাঠিয়ে খোঁজ করেও আমাদের প্লেনটির আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। হঠাৎ প্লেনটি যেন শূন্য আকাশে হাওয়ার মত মিলিয়ে গেছে।

এই ব্যাপার নিয়ে কাগজে কিছুদিন সোরগোলের পরই সামরিক বিবৃতিতে সব যে ঠাণ্ডা হয়ে যায় তা আগেই বলেছি। সামরিক বিবৃতিতে বলা হয় যে, প্লেনটি সমুদ্রের ওপরই ভেঙে পড়ে ডুবে গেছলো। র‍্যাডার-স্ক্রীন ঝাপসা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একেবারে অস্বীকার করা হয়।

কিন্তু, আসল কথা যে তা নয়, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণে জানতে পারলে পাছে আতঙ্কগ্রস্ত হয়, সেইজন্যেই ওরকম মিথ্যে খবর দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ লোককে আশ্বস্ত করলেও, দেশের ওপরওয়ালারা তখন রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠেছেন।

ইতিপূর্বে নানা দিকে—বিশেষ করে' আমেরিকার বহু জায়গা থেকে

রহস্যজনক ওইরকম আকাশ-যানের সংবাদ বহুবার পাওয়া গেছে। দর্শকদের চোখের ভুল ও বাজে লোকের আজগুবি কল্পনা বলে' উড়িয়ে দিয়েও সাধারণের গুজব বন্ধ করা যায়নি। এবার সামরিক কর্তারা নিজেরাও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হ'লেন যে, সাধারণের গুজবের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে। বাইরে উচ্চবাচ্য না করলেও গোপনে গোপনে এ-বিষয়ে ব্যাকুল ভাবে তাঁরা অনুসন্ধান চালাতে লাগালেন। সে অনুসন্ধানের কোনো ফলই কিন্তু পাওয়া গেল না। ব্যাপারটার কোন হদিস্ না পেয়ে তাঁরা ক্রমশ দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

আজ পর্যন্ত দিশাহারা হয়েই তাঁদের থাকতে হতো, যদি—নিউ-ইয়র্কের বাজারে মিঙ্ক সেবল্ আর মাইন প্রভৃতি বিরল পশুলোমের দাম হঠাৎ অসম্ভব চড়ে না যেতো।

যাত্রী-প্লেনটির খোঁজ না পেয়ে আমরা তখন জেট-বম্বারে আমেরিকাতেই নেমে নিউ-ইয়র্কের এক হোটেলে আছি। দিন দুই বাদে, বিলেতেই আবার আমাদের ফিরে যাবার কথা। মিঃ ডোনাট্ আমার সঙ্গে এক ঘরেই ছিলেন। সেদিন সকালবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বিরক্ত হয়ে তিনি কাগজটা ফেলে দিয়ে বললেন,—এমন হুজুগে-জাত দুনিয়ায় নেই।

ইংরেজরা মনে-মনে মার্কিনদের ওপর একটু চটা জেনে হেসে জিজ্ঞাসা করলাম,—'মার্কিনদের আবার নতুন কি হুজুগ দেখলেন?'

কাগজটা তুলে আমার হাতে দিয়ে ডোনাট্ বললেন,—'দেখুন না, এত বড়-বড় কাণ্ড দুনিয়ায় চলছে, তার জায়গায় কোথায় ল্যাব্রাডরে পশুলোম দুষ্প্রাপ্য হয়েছে তাই নিয়ে কাগজে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। আবার কোন্ এস্কিমো শিকারী কি আজগুবি গল্প বানিয়ে বলেছে তাও সবিস্তারে ছাপা হয়েছে।

কাগজটা পড়ে দেখলাম, ডোনাট্ ঠিকই বলেছে। সেব্‌ল মিঙ্ক প্রভৃতি যে সব পশুলোম পৃথিবীর সেরা ধনীদের অত্যন্ত আদরের জিনিস, সে সব মেরু

প্রদেশ বিশেষ করে ল্যাব্রাডরের উত্তর অঞ্চল থেকেই আমেরিকায় আসে। যারা ফাঁদ পেতে তুষার-অঞ্চলের এসব প্রাণী ধরে তাদের বলে—'ট্র্যাপার'। এ-বছর ট্র্যাপাররা তাদের শিকারের জায়গায় একটি প্রাণীর ল্যাজও দেখতে পায়নি। নানুক নামে সেখানকার একজন বুড়ো ট্র্যাপার নাকি এস্কিমোদের কাছে এ বিষয়ে একটা আজগুবি গল্পও শুনে এসেছে। গল্পটা এই যে, ল্যাব্রাডরে এককালে যে-দেবতাদের ভয়ে কোনো সাদা মানুষ পা দিতে সাহস করতো না, তারা নাকি ফিরে আসছেন। পশু-পাখীরা তাই ল্যাব্রাডর ছেড়ে পালাচ্ছে। এর পর মানুষকেও পালাতে হবে।

এ গল্পের সঙ্গে, পাশে আর একটা খবর পড়ে' আমি কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'মিঃ ডোনাট্, তৈরী হয়ে নাও। এখুনি আমাদের ল্যাব্রাডরে যেতে হবে।'

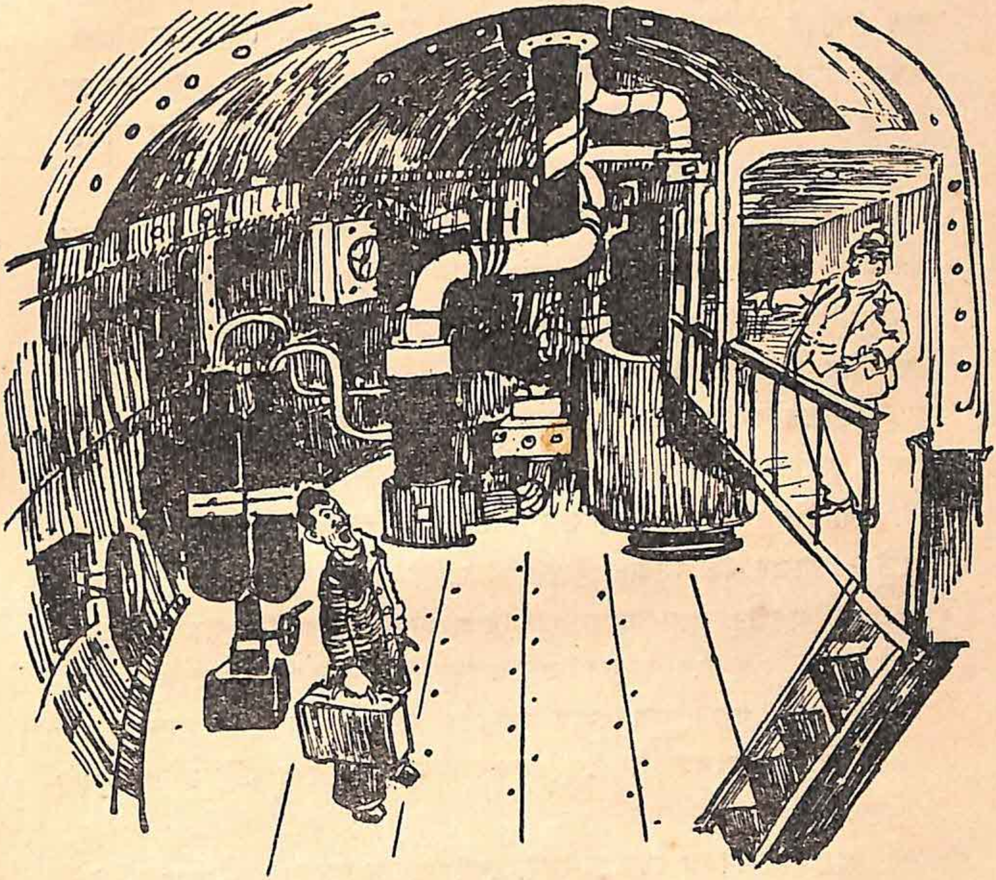
'তুমি কি পাগল হোলে নাকি!' মিঃ ডোনাট্ অবাক্ হয়ে বললেন, 'পরশু আমাদের বিলেত যেতে হবে। এখন ল্যাব্রাডরে যাবো কি!'

'হ্যাঁ, ল্যাব্রাডরেই আমাদের যেতে হবে। বম্বার নিয়ে যাদের ফিরে যাবার তারা যাক। সেনর গ্যালিকো আর যাত্রী-প্লেনের রহস্য যদি ভেদ করতে চাও তো আমার সঙ্গে চলো।'

'কিন্তু যাবো কিসে? ল্যাব্রাডর তো আর বোস্টন সিকাগো নয় যে, ট্রেনে চেপে বসলেই হলো।'

'যাবো, প্লেন ভাড়া করে। তুমি তৈরী হও।'

প্লেন ভাড়া করে' সেইদিনই ল্যাব্রাডরের ব্যাটল্-হারবারে গিয়ে নামলাম। সেখান থেকে—বিশেষ ধরনে তৈরী, কতকটা শালতির মত লম্বা মোটর-বোট ভাড়া করে' হ্যামিলটন নদী দিয়ে চললাম, ডাইক-লেকের দিকে। ডাইক-হ্রদে পৌঁছোবার আগে লবষ্টিক-হ্রদের কাছেই বিরাট হ্যামিলটন জলপ্রপাত। সেখানে পৌঁছে মোটর-বোট ছেড়ে, হাঁটা-পথে রওনা হলাম একজন পথপ্রদর্শক নিয়ে। সে পথপ্রদর্শক আর কেউ নয়; নিউ-ইয়র্কের কাগজে যার গল্প বেরিয়েছিল



সেই এস্কিমো ট্র্যাপার নানুক। ব্যাটল্-হারবারে নেমেই 'ফার' অর্থাৎ পশুলোমের ব্যবসাদারদের কাছে নানুকের খোঁজ করে' জেনেছিলাম, হ্যামিলটন-জলপ্রপাতের কাছে ট্র্যাপারদের প্রথম যে চটি আছে, সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে। ব্যবসা মন্দা হওয়ার দরুন সে আজকাল সেই চটিতেই ফাইফরমাশ খেটে দিন কাটায়।

আমরা ডাইক-লেকেরও উত্তরে যেতে চাই শুনে প্রথমে নাহুক আমাদের পথ দেখাতে রাজীই হয়নি। ভালোরকম বকশিশের লোভ দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী করাই। রাজী হয়েও তার বিস্ময় কিন্তু সে চেপে রাখতে পারেনি। ডাইক-লেকের উত্তরে কোনো জানোয়ার পর্যন্ত আজকাল পাওয়া যায় না। সেখানে কি সুখে আমরা যেতে চাই ?

তার কথার উত্তর না দিয়ে, পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম,—হঠাৎ ও-অঞ্চলের অমন দুর্দশা হবার কারণ কি ?

নাহুক এমনিতেই কম কথা বলে। এ-প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'গেলেই জানতে পারা যাবে।'

জানতে সত্যিই শেষ পর্যন্ত পারা গেল। কিন্তু যা জানলাম তা সত্য, না স্বপ্ন, এখনো মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়।

পাঁচদিন হাঁটা-পথে চলবার পর আমরা সেদিন এ-অঞ্চলের শেষ একটি চটিতে রাত্রের মত আশ্রয় নিয়েছি। চটিটি অবশ্য পরিত্যক্ত। পশুলোম দুষ্প্রাপ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, চটি যারা চালায় তারা নিরুপায় হয়ে চলে' গিয়েছে! শুধু জংলা-গাছের তৈরী তাদের আস্তানাটা আছে পড়ে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোতে যাবো এমন সময় নাহুক এসে খবর দিলে, জঙ্গলের পথে কে একজন লোক আমাদের এই চটির দিকেই আসছে।

পশুপক্ষী পর্যন্ত যেখানে নেই, সেই শ্মশান রাজ্যে কে লোক এদিকে আসতে পারে! মিঃ ডোনাট্‌ তো অবাক্‌ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এই অন্ধকারে, লোক আসছে, তুমি দেখলে কি করে ?'

'দেখিনি, শুনতে পাচ্ছি !'—নাহুক সংক্ষেপে জানালে।

কান পেতে আমরা কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না। মিঃ ডোনাট্‌ বিরক্ত হয়ে নাহুককে বকুনি দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমাদের কাছে যেমন ছাপানো বই, নাহুকের কাছে তেমনি জঙ্গল। সে

এখানে সামান্য ঝরাপাতা দেখে বা অস্ফুট একটা শব্দ শুনে যা বুঝতে পারে আমাদের পক্ষে তা অসাধ্য।

নান্নুকের কথা যে সত্যি, খানিকবাদেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাইরের পদশব্দ এবার আমরাও শুনতে পেলাম। কিন্তু কে এই লোক? বন্ধু, না শত্রু? এ-অঞ্চলের অ্যালগনকুইন-জাতির রেড-ইণ্ডিয়ানরা, শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে আজকাল কখনো কখনো অত্যন্ত হিংস্র হয়ে ওঠে। সুবিধে পেলে, নির্জন জায়গায় তারা যে খুন জখম করতে দ্বিধা করে না, তার যথেষ্ট নজির আছে।

পিস্তলটা বার করে তাই কোলের ওপর রাখলাম।

কিন্তু পিস্তলের কোনো প্রয়োজন হলো না।

ক্লান্তপদে প্রায় টলতে টলতে যে লোকটি কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো, তাকে দেখে মিঃ ডোনাট্ ও আমি দুজনেই অবাক্।

মিঃ ডোনাট্ উঠেই তাকে ধরে' ফেলে বললেন,—'একি, কর্ণেল মিচেল! আপনি এখানে কোথা থেকে?'

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে লোকটাকে ধরেছিলাম। তাঁকে আমাদের বিছানার ওপর বসিয়ে দিয়ে মিঃ ডোনাটের দিকে অবাক্ হয়ে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম,—'কর্ণেল মিচেল কাকে বলছেন?'

'বাঃ—এই তো আমাদের সামরিক-বিভাগের গোয়েন্দা, কর্ণেল মিচেল। যাত্রী-প্লেনে, ইনিই তো পাহারা দেবার জন্যে ছিলেন।'

'তাই নাকি!' একটু হেসে বললাম, আমি কিন্তু এঁর আরেকটা নাম জানি।'

'আরেকটা নাম!' মিঃ ডোনাট অবাক্।

'হ্যাঁ। সে নাম হলো—সেনর গ্যালিকো।'

'না, আপনাকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব, মিঃ দাশ।' ক্লান্তভাবে একটু হেসে গ্যালিকো তার জামার ভেতরের পকেট থেকে একটি কাগজের প্যাকেট বার

করে' আমার হাতে দিয়ে বললে, 'যার জন্যে এতদূর ধাওয়া করেছেন, এই নিন সেই ফাইল। এতে আর আমার দরকার নেই। গুপ্তচরগিরি আমার শেষ।'

কঠিন স্বরে বললাম,—'তোমাকে আমি চিনি গ্যালিকো! তুমি কি ভেবেছো, সামান্য একটু অভিনয় করে' আমায় ফাঁকি দেবে! এ ফাইল যে তুমি নকল ক'রে রাখোনি তার প্রমাণ কি।'

'প্রমাণ!' গ্যালিকো একটু হাসলে, 'হ্যাঁ বিপদ যতই থাক, এখনো আমার সঙ্গে গেলে বোধ হয় তার প্রমাণ দিতে পারবো। তখন আশা করি, বুঝবেন যে, পরস্পরের তুচ্ছ ক'টা অ্যাটমিক অস্ত্রের গোপন কৌশল জানবার জন্যে আর জাতিতে জাতিতে আমাদের কাড়াকাড়ি মারামারির কোনো দরকার নেই। এখন শুধু আমায় একটু বিশ্রাম করতে দিন। কাল সকালেই আমি আপনাদের প্রমাণ দিতে নিয়ে যাবো।'

সত্যিই পরের দিন একটু সুস্থ হয়ে গ্যালিকো, নানুক বাদে, আমাদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে, ডাইক-হ্রদের উত্তর দিকেই রওনা হলো। সেদিকে যত এগিয়ে যাই, ততই অবাক্ হয়ে যেতে হয়। ল্যাব্রাডর অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেরু-প্রবাহ-ঘেঁষা দেশ হলেও, বন্ধ্যা তুষার-প্রান্তর নয়। ভূর্জ দেবদারু ইত্যাদি জাতের গাছ ও নানা লতাগুল্ম সেখানকার অধিকাংশ পাহাড়ী উপত্যকা ছেয়ে আছে। কিন্তু এদিকে সমস্ত গাছপালা কি এক অভিশাপে যেন বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। জন্তু-জানোয়ার অনেক আগে থেকেই বিরল হয়ে আসছিল, এদিকে অগ্রসর হওয়ার পর একটা পাখার ডাকও সারাদিনে শোনা গেল না! দু'দিন এইভাবে এগিয়ে আমরা যে অনুচ্চ পাহাড়ের ধারে গিয়ে পৌঁছলাম, তার মাথা ডিঙিয়ে গেলেই পশ্চিমে ডাইক-হ্রদ ও তার চারিধারের উপত্যকা পাওয়া যাবে।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছলো বলে', এপারেই রাতটা কাটিয়ে, পরের দিন সকালে পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে একেবারে স্তম্ভিত

হয়ে গেলাম! ডাইক-হ্রদের চারিধারটা যেন একটা বিরাট ভাগাড়, গরু-মহিষের নয়,—এরোপ্লেনের। এত ভাঙা এরোপ্লেন এখানে কি-করে' জড় হলো?

গ্যালিকোই আমাদের মনের কথা অনুমান করে' এবার সেই ভয়ংকর রহস্য আমাদের বুঝিয়ে দিলে।

বললে,—'একরকম চোখের ওপর ঘটেছে বলে' আমাদের প্লেনের অন্তর্ধানের ব্যাপারটাতেই তোমাদের টনক নড়েছে, কিন্তু তার আগে গত তিন বছর ধরে যে সব এরোপ্লেন নিখোঁজ হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনাই তার কারণ হবে বলে' লোকে অনুমান করে। কিন্তু অধিকাংশই তার দুর্ঘটনা নয়।'

'কিন্তু এখানে এসব প্লেন এল কি করে?' অবাক্ হয়ে ডোনাট্ জিজ্ঞাসা করলেন।

'যেমন করে' আমাদের প্লেন এসে পড়েছিল।' বলে গ্যালিকো সমস্ত বিবরণই এবার দিলে,—'আসল কর্ণেল মিচেলকে তার ঘরেই বন্দী করে'—কর্ণেল মিচেল সেজে আমি গোপনীয় কাগজ নিয়ে প্লেনে এসে উঠি। ক্রয়ডেন থেকে যখন প্লেন ফেরাবার হুকুম আসে, তখন বিপদ বুঝে, বম্বারের কণ্ট্রোল-রুমে গিয়ে কথা বলতে বলতে কৌশলে রেডিও অপারেটারকে বিষাক্ত ছুঁচ ফুটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলি। পাইলট আর অপারেটার ছাড়া সে-কামরায় কেউ থাকে না। পাইলট তার নিজের কাজেই তন্ময়। ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক অসুস্থতা বলে' সে মনে করে। যেন নেহাত বাধ্য হয়ে আমি তখন অপারেটারের কাজ হাতে নিই এবং খানিক বাদেই পাইলটকে খবর জানাই যে, ক্রয়ডেন থেকে ভুল করে' প্রথম হুকুম পাঠানো হয়েছিল, এখন ভুল সংশোধন করে' তারা আমাদের আবার আমেরিকা যেতেই বলেছে। পাইলট সরল বিশ্বাসে তাই করে। আমেরিকার কাছে প্রায় যখন পৌঁছে গেছি, তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। হঠাৎ র‍্যাডার-যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। সেই সঙ্গে এরোপ্লেনের ইঞ্জিনও। কিন্তু পড়ে না গিয়ে, কোনো অদৃশ্য শক্তির টানে আমাদের প্লেন

অসম্ভব বেগে আরো উঁচুতে উঠে যায়। ওই অসম্ভব বেগ আর আকাশের ওপারের স্তরের হাওয়ার অভাব ও ঠাণ্ডায় সবাই প্রায় জ্ঞান হারায়। জ্ঞান যখন ফিরে আসে, তখন দেখি এই এরোপ্লেনের ভাগাড়ে পড়ে আছি।'

'কিন্তু, আর-সব যাত্রীরা কোথায়?'

'জানি না। হয়তো কোথাও চালান হয়ে গেছে। নিজে যে কিভাবে তাদের নজর এড়িয়ে বেঁচে গেছি, তাও বলতে পারি না। তবে, বেঁচে গেছি বলা ভুল; কারণ তারা…'

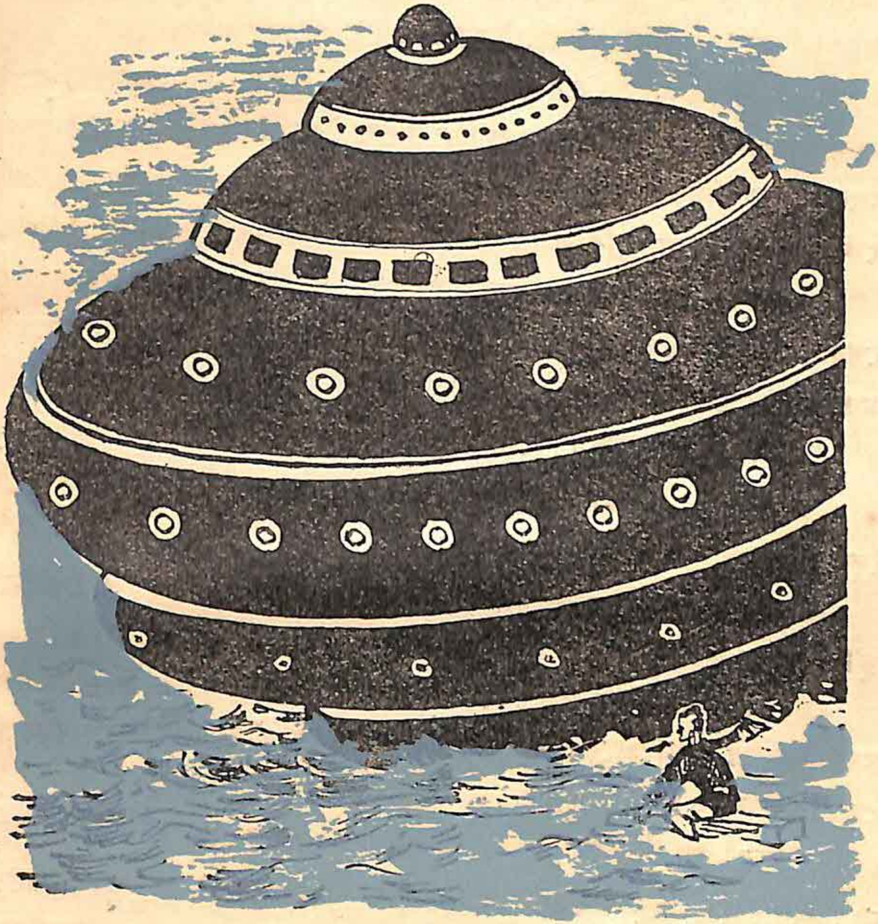
গ্যালিকোর অবান্তর কথায় বাধা দিয়ে বললাম,—'তারা বলছো কাদের? আর এখানে এসব প্লেন এনে ফেলার মানে-ই বা কি!'

'তারা কারা, জানি না। চোখে অন্ততঃ তাদের দেখিনি, দেখা যায় না বলেই আমার ধারণা। কিন্তু এখানে এসব প্লেন এনে ফেলার মানে তো অতি সহজ।'

'কি মানে?'—ডোনাট্ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

গ্যালিকো অত্যন্ত দুঃখের হাসি হেসে বললে,—'কোনো অজানা জঙ্গলের দেশে আমাদের কোনো বৈজ্ঞানিক-অভিযান পাঠালে প্রথম কি করা হয়? ভালো দেখে একটা থাকবার জায়গা বেছে, তার চারিধার পরিষ্কার করে' যতদূর সম্ভব ওষুধ ছড়িয়ে বিষাক্ত পোকা-মাকড় ও জন্তু-জানোয়ার মারবার ব্যবস্থা করা হয়। ল্যাব্রাডরের এ-অঞ্চলে যে-গাছপালা পশুপক্ষী আর নেই, তার কারণ, এদের এমন কোনো ওষুধ বা রশ্মি আছে যা আমাদের বিজ্ঞানের কল্পনার অতীত। নিজেদের থাকবার জায়গা নিরাপদ করে' আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা তারপর কি করে? জঙ্গল থেকে যা-কিছু দরকারী মনে হয়, জ্যান্ত বা মরা সংগ্রহ করে' আনে পরীক্ষা করবার জন্যে। এরাও তাই করছে। এদের কাছে পৃথিবী একটা অজানা জঙ্গলমাত্র।'

'কিন্তু এরা কি রকম জীব এবং কোথা থেকে এসেছে তার কিছু আভাস পেয়েছো?'



'না তা কিছুই পাইনি, তবে যাতে এসেছে তার একটা বোধ হয় এখনো দেখাতে পারি।' বলে গ্যালিকো এবার হ্রদের কাছে আমাদের নিয়ে নেমে গেল।

সবিস্ময়ে দেখলাম, সেখানে ডাইক-হ্রদের জলের ওপরে যে জিনিসটি

ভাসছে, তাকে একমাত্র ছেলেদের খেলবার চাক্‌তি লাট্টুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। আকারে কিন্তু তা ছোটোখাটো একটা জাহাজের মত বিরাট।

গ্যালিকো সেটা দেখিয়ে বললে,—'আমার ধারণা, গত ক'বছর ধরেই এরা এখানে আসছে। এসে ক'দিন তাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাল-মশলা সংগ্রহ করে' নিয়েই আবার চলে যায়। এবার যাবার সময় কেন যে এটি ফেলে গেছে বলতে পারি না।'

হ্রদের ধারেই অনেক বড় বড় গাছ কাটা পড়েছিল। গ্যালিকোর কথা শেষ হবার আগেই আমি তার একটা হ্রদের জলে ভাসিয়ে তার ওপর ঘোড়ার মত করে' চেপে বসলাম।

'ওটা কি করছো কি!' ডোনাট্ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

'যা করছি, তোমরাও তাই করো। ও যন্ত্র-যানের ভেতর কি আছে দেখতে হবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেও গ্যালিকো ও ডোনাট্, তারপরই আমার মত দু'টি কাঠের গুঁড়ি নিয়ে ভেসে পড়লো।

সেইভাবে হাত দিয়ে জল কেটে সেই বিরাট যন্ত্র-যানটার কাছে গিয়ে, অনেক কষ্টে পোর্টহোলের মত একটা বড় ফোকর খুঁজে পেয়ে কোনোরকমে ভেতরে ঢুকলাম।

ভেতরে তো ঢুকলাম, কিন্তু এ যন্ত্র-যানের রহস্য তো কিছুই বোঝা যায় না। চারিধারে শুধু উজ্জ্বল রূপালী একরকম ধাতুর দেওয়াল-দেওয়া করিডর এদিকে-ওদিকে চলে গেছে। এ যন্ত্র-যান যাদের—তারা থাকে কোথায়, খায় কি, যন্ত্র-যান চালায়ই বা কি করে'?

কি করে' না হোক, কোথা থেকে চালায় খানিকবাদেই বুঝতে পারলাম মনে হলো। যন্ত্র-যানের ঠিক মাঝামাঝি আগাগোড়া ঝাপসা কাঁচে-ঢাকা একটা ঘর, তার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড নীচু টেবিলের ওপর অসংখ্য নানা রঙের বোতাম যেন আঁটা আছে।

আমি সেই বোতামগুলো এলোপাথাড়ি টিপতে শুরু করতেই ডোনাট্ হাঁ-হাঁ করে উঠলো। ওকি করছেন কি! কিসে কি হয়ে এটা হয়তো চলতে শুরু করবে।

উত্তেজিতভাবে বললাম, 'আমি তো তাই চাই। এ যন্ত্র-যান যদি সভ্য-জগতে নিয়ে গিয়ে, ভেঙে পড়েও মরি, তবু এর ভাঙা টুকরো থেকে আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা হয়তো তাদের অজানা-বিদ্যা শিখতে পারবে।'

কথা বলতে-বলতে বোতাম টিপে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘরের ঝাপসা-কাঁচ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে ডাইক-লেকের চারিধার ঘরের দেওয়ালে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তারপর যেন বিদ্যুৎগতিতে সে হ্রদ নীচে কোথায় তলিয়ে গেল।

আমরা আকাশে উঠেছি, উল্কাবেগে আকাশে ছুটে যাচ্ছি, কিন্তু কোন্ দিকে! নীচে যেন সাদা তুষার প্রান্তর দেখা যাচ্ছে। তবে কি—উত্তর মেরুর দিকেই চলেছি? যেমন খুশি আবার আর ক'টা বোতাম টিপলাম। হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে যন্ত্র-যান ঘুরে চললো। একি? ওই তো সেণ্ট লরেন্স উপসাগর। নীচে যেন ম্যাপের মত আঁকা রয়েছে। ওই তো নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড। আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই চলেছি। কিন্তু সমুদ্র যেন হু-হু করে আমাদের দিকে ছুটে আসছে! আমরা নীচে পড়ে যাচ্ছি নাকি? আর কয়েকটা বোতাম টিপলাম। হঠাৎ আবার পাক-খেয়ে আমাদের যন্ত্র-যান উঠে যাচ্ছে! এবার শুধু আকাশ, আর নীচে মেঘের ফাঁকে আতলান্তিক সমুদ্র। খানিকক্ষণ এভাবে চললেই বোতামগুলোর রহস্য কিছু হয়তো বুঝতে পারবো। তখন নিউ-ইয়র্ক বা সে-রকম কোনো শহরের কাছে কোনো হ্রদ বা উপসাগরে এ যন্ত্র-যান নামানো শক্ত হবে না। উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে! খুঁড়তে খুঁড়তে গোখরো নয়, একেবারে অজগর আমিই ধরবো। কোথায় গুপ্তচরের সন্ধান, আর কোথায় দুনিয়ায় কেউ যা কখনো ভাবেনি, সেই অন্য গ্রহের যন্ত্র-যান দখল করে নিয়ে আসা!

অ্যাটমিক বোমার যুগকেও যারা পেছনে ফেলে গেছে, তাদের বৈজ্ঞানিক বিদ্যার সন্ধান পাওয়া !

হঠাৎ গ্যালিকো চীৎকার করে উঠলো—'ওই দেখ।'

দেখলাম এবং বুঝলাম, আমার সব আশায় ছাই পড়তে চলেছে।



আকাশে হঠাৎ কোথা থেকে আমাদের মত আরো তিনটি চাক্‌তি-লাট্টু এসে উদয় হয়েছে। বুঝলাম, যন্ত্র-যানের আসল মালিকেরা ফিরে এসেছে। ফিরে এসে তাদের যন্ত্র-যান দেখতে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের খোঁজে বেরিয়ে এতক্ষণে সন্ধান পেয়েছে। এরা ওস্তাদ আর আমি চালাবার বিদ্যা কিছুই জানি না। এরা আমায় ধ্বংস করে ফেলবেই।

তবু উন্মত্তের মত টিপে চললাম। আকাশে যেন চারটে উল্কার পাগলামির খেলা শুরু হয়ে গেল। এই আমি উঠি, তারা নামে। এই তারা আমাদের একেবারে গা ঘেঁষে চলে যায়।

হঠাৎ কি ভাবে জানিনা তাদের অনেক দূর পিছিয়ে ফেলে আমাদের যন্ত্র-যান ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি বোতাম টেপা ছেড়ে দিয়েছি। তারা কিছুতেই আর দৌড়ের পাল্লায় পারছে না। আমাদের যন্ত্র-যান আতলান্তিকের ওপর দিয়ে আমেরিকার দিকেই চলেছে। ভেঙে পড়তে হয় সেখানেই গিয়ে পড়বো।

কিন্তু তা আর হলো না। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে বুঝতে পারলাম আমাদের যন্ত্র-যান থেমে গেছে। থেমে, দুরন্ত বেগে নিচের সমুদ্রে পড়ছে। কোন অদৃশ্যশক্তিতে তারা আমাদের কল বিগ্‌ড়ে দিয়েছে।

সমুদ্রে পড়ার আগে পর্যন্ত মনে আছে। তারপর যখন জ্ঞান হলো তখন জেলেদের একটা ট্রলারে শুয়ে আছি। ডোনাট্ আর গ্যালিকো যন্ত্রযানের সঙ্গেই আতলান্তিকের অতলে তলিয়ে গেছে।

ঘনাদা প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। শিবুর কাশি আবার শুরু হতেই, গৌর তাকে ধমক দিয়ে শাসিয়ে বললে, 'আচ্ছা, আপনি হঠাৎ ডাইক-হ্রদের দিকে যাওয়ার হদিস পেলেন কোথায় ?'

ঘনাদা একটু হেসে বললেন, 'ডোনাট্ও এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। হদিস্ পেয়েছিলাম যে উড়ন্ত-চাকতি নিয়ে আমেরিকায় এখনো হুলুস্থূল চলছে, তার সমস্ত গুজব ভালো করে' বিশ্লেষণ করে। সেই সমস্ত গুজব থেকেই মনে হয়েছে এই সব লাট্টু আকারের অদ্ভুত জিনিসগুলি আমেরিকার উত্তর-পূর্ব কোন দিক থেকেই সাধারণতঃ প্রথম দেখা দিয়েছে। এর সঙ্গে ল্যাব্রাডরের পশুলোমের ব্যবসায়ে মন্দা পড়ার খবর যোগ দিয়েই আমার মনে হয়, পশুলোম যেখান থেকে বেশী পাওয়া যায় সেই ডাইক হ্রদের কাছেই সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

শিবুর কাশি এবার আর ধমক দিয়েও থামানো গেল না। ঘনাদা বিষ-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মনের ভুলে বোধ হয় শিশিরের গোটা সিগারেটের টিনটাই হাতে নিয়ে উঠে গেলেন।